অদ্ভুত ঘটনা।

সর্ব্বদা উচ্চ উচ্চ ভাবের প্রসঙ্গে শ্রোতা ও বক্তার শুশ্রূষা ও বিবক্ষা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এজন্য মধ্যে মধ্যে দুই একটী অদ্ভুত কথার প্রসঙ্গ থাকা মন্দ নয়। তাই বামাবোধিনীর পাঠিকাগণকে মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত কথা শুনাইব। (১)

প্রায় শতাব্দী অতীত হইল, এ ঘটনা বর্দ্ধমান জেলার কোনও পল্লীগ্রামে ঘটিয়াছিল। আমার ৺ পিতামহ ঠাকুর প্রাতঃস্মরণীয় রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বহু মন্ত্রশিষ্য ছিল। একদা ভাদ্র মাসে মনসাপূজার সময় তিনি কুলীনগ্রামে শিষ্যালয়ে গিয়াছিলেন। তখন ঐ সকল অঞ্চলে মনসাপূজার খুব ধুম হইত। প্রশস্ত ময়দানে বৃহৎ মেলা বসিত, এবং তথায় কয়েকদিনাবধি মনসার গান, যাত্রা, ছড়া, ঝাঁপান, নাচ, তামাসা প্রভৃতি হইত। তথায় নানা স্থানের প্রসিদ্ধ মালেরা (সাপুড়িয়ারা) বড় বড় আভাড়া কেউটা, গোখুরা, প্রভৃতি ভীষণ সর্প লইয়া প্রদর্শন করিত ও মন্ত্রাদিপ্রভাবে বিবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইত। পিতামহ ঠাকুর ঐ মেলা ও প্রদর্শনী দেখিবার জন্য উৎসুক হওয়ায়, মেলাস্থানে তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আসনাদি সজ্জিত হইল। তিনি শিষ্যগণ সহ তথায় গমন করিলেন। তাঁহার অদূরেই সর্পক্রীড়া হইতেছিল। কোনও মাল এক মুষ্টি তৃণ হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া, শরা ও দড়ি দিয়া হাঁড়ির মুখ বাঁধিয়া, বলিল,—কার সাধ্য, এ শরা খুলুক, ইহার মধ্যে যত তৃণ আছে, তত সর্প বাহির হইবে। তাহা খুলিতে কেহ সাহস না করায়, সে তাহা নিজে খুলিল। খুলিবামাত্র তাহা হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ কেউটার ছানা ফণা তুলিয়া বাহির হইতে লাগিল। সর্পগুলা এরূপ বিষাক্ত যে, তাহার একটার দংশনমাত্র একটা বৃহৎ ছাগ পঞ্চত্ব পাইল। সকলে ভীত হওয়ায়, সে সর্পগুলাকে কেঁচোর ন্যায় ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিল, অথচ একটাও তাহাকে দংশন করিল না। হাঁড়িতে পুরিয়া সে শরা ঢাকা দিয়া, মন্ত্র পড়িতে পড়িতে শরা স্পর্শ করিল এবং শরা খুলিয়া দেখাইল,—তন্মধ্যে পূর্ব্ববৎ সেই তৃণমুষ্টি রহিয়াছে। এরূপও শুনিয়াছি,—মালেরা পরস্পরকে সর্প দ্বারা দংশন করাইয়া, দষ্ট ব্যক্তি ঢলিয়া পড়িলে, মন্ত্রবলে পুনরায় তাহাকে উজ্জীবিত করিত। যে মাল যত অদ্ভুত শক্তি দেখাইত, সে তদনুরূপ সম্মানিত ও পুরস্কৃত হইত। কিন্তু সময়ে সময়ে দুর্ঘটনা ঘটায়, বহুকালাবধি

(১) পূর্ব্ববারে আমার কোনও শিষ্য ও তাঁহার মৃতা পত্নীর প্রেতযোনির কথা বামাবোধিনীতে লিখিয়াছিলাম। অমৃতবাজার পত্রিকার বরেণ্য সম্পাদক মহোদয় তাহা ইংরাজিতে অবিকল অনুবাদ পূর্ব্বক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

রাজবিধি দ্বারা ঐ সকল ক্রীড়া ও চৈত্র-মাসের গাজন-সন্ন্যাসে বাণফোড়া প্রভৃতি রহিত হইয়াছে।

সেই মেলায়, একজন মাল এক প্রকাণ্ড ও অতি ভীষণ কেউটা আনিয়াছিল। তাহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ও ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া, লোক সকল ভয়ে পলাইতে লাগিল। তাহার বিষ ভাঙা হয় নাই, এজন্য মাল অতি সাবধানে ক্ষণমাত্র তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া তাহাকে সিন্দুকে পূরিল।

মেলা দেখিয়া আসিবার সময় এক ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া পিতামহকে নমস্কার করিলেন। পিতামহ প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? নিবাস কোথায়? আগন্তুক করযোড়ে বলিলেন,—দাদা! আমাকে চিনিতেছেন না? আমি সেই 'মুকুট,' আপনার দাস। তাঁহার নাম মুকুটচন্দ্র শিরোমণি। তখন পিতামহ বলিলেন,—ভাই! তোমার আকৃতির ও বেশভূষার এত পরিবর্ত্তন যে, চিনিতে পারি নাই। বিশেষতঃ তুমি বৃহৎ গোঁপ-দাড়ি রাখায় এবং সিন্দূরে ও রক্তচন্দনে ভূষণ্ডী হওয়ায়, প্রথমে চিনিতে পারি নাই। মুকুট কহিলেন,—সে যাহা হউক, অদ্য আমার বাটীতে আপনাকে পদধূলি দিতে হইবে। আমিও আপনার শিষ্য।

পূর্ব্ব কথা এই,—পিতামহ যখন কালনায় দর্শনশাস্ত্র পড়িতেন, তখন মুকুট শিরোমণি তথায় ছাত্র ছিলেন। পিতামহ কৃতবিদ্য ও শ্রেষ্ঠ ছাত্র হওয়ায়, তাঁহাকেই অনেক সময় ছাত্র পড়াইতে হইত। মুকুটের দর্শনশাস্ত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভের আশা নাই জানিয়া, পিতামহ তাঁহাকে বিদায় দিয়া বলিয়াছিলেন,—ভাই! তোমার এদিকে ফললাভের আশা নাই। বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, অন্য বিষয়ে যত্ন কর। তদবধি তিনি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। শেষে কামরূপে কোনও সাধুর প্রিয়শিষ্য হয়েন। কিন্তু তিনি প্রকৃত জ্ঞানমার্গের কোনও সন্ধান পান নাই। সেই সন্ন্যাসীর কৃপায়, ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডামর-সর্প-ব্যাঘ্রাদির বশীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দারপরিগ্রহ না করিয়া চিরসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পিতামহ কহিলেন,—শিষ্যেরা স্নানাহার না করাইয়া আমাকে ছাড়িবে না। আমি আহারাদির পর তোমার বাটী যাইব। তাহা শুনিয়া মুকুট স্বগৃহে গেলেন। পিতামহের শিষ্যালয় হইতে মুকুটের বাটী প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। তিনি স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া যানারোহণে মুকুটের বাটীতে গেলেন। মুকুট একান্ত ভক্তিভাবে পিতামহের অভ্যর্থনা করিলেন। অনন্তর পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পিতামহ কহিলেন,—আজি মেলায় যে কেউটা দেখিয়াছি, সেরূপ ভীষণ ও বৃহৎ কেউটা আর কখনও দেখি নাই। মুকুট বলিলেন,—যদি সে সাপ আবার দেখিতে চান, আমি এই গৃহমধ্যেই দেখাইতে পারি। পিতামহ বিস্মিত

হইয়া কহিলেন,—তবে দেখাও। মুকুট তখনি তাঁহার গৃহস্থিত দেবমূর্ত্তির সম্মুখে আসনে বসিলেন এবং পিতামহকে তৎপার্শ্বস্থ উচ্চ বেদিকায় বসাইয়া বলিলেন,—আপনি ধ্যানস্থের ন্যায় নিশ্চলভাবে থাকুন। সর্প আমার সম্মুখ দিয়া যাইবে। কোনওরূপ অঙ্গচালন বা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবেন না। কোনও ভয় নাই। পিতামহ নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। মুকুট অনেকক্ষণ মন্ত্রজপ করিয়া হুঙ্কারপূর্ব্বক দেবপীঠে একটী পুষ্প নিক্ষেপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে অদূরে ভীষণ গর্জ্জন হইতে লাগিল। মুকুট অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা পুনরায় পিতামহকে স্থিরভাবে থাকিতে বলিলেন। পরক্ষণেই সাক্ষাৎ কৃতান্ত সেই ফণিমূর্ত্তি তথায় উপস্থিত। মুকুট হস্তস্থিত জবাপুষ্প তাহার দিকে ধরিবামাত্র, সে শূর্পাকৃতি বৃহৎ ফণাচক্র সঙ্কুচিত করিয়া নিস্পন্দভাবে মুকুটের দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া রহিল। পিতামহ ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া, কটাক্ষসঙ্কেতে ফণীন্দ্রকে বিদায় দিতে বলিলেন। মুকুট ইঙ্গিত করিবামাত্র ফণী নতশীর্ষে প্রস্থান করিল। মুকুট সে দিন পিতামহকে আরো অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন। বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না।

পিতামহ সে বাটীতে একটী কন্যা দেখিলেন। কন্যাটী অতি ভক্তিভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিল। তাহার বয়স ষোল বর্ষের অধিক হইবে না। সে শ্যামাঙ্গী হইলেও, শান্ত, পবিত্র; কোমল লাবণ্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে উচ্ছলিত। তাহার মুখমণ্ডলে সারল্য ও বিনয়ের অপূর্ব্ব মধুরিমা। পিতামহ স্নেহার্দ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভাই মুকুট! তুমি অকৃতদার সন্ন্যাসী, অথচ এ কন্যা তোমাকে পিতা বলিতেছে। তুমি কি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলে? মুকুট বলিলেন,—না দাদা! বিবাহ করি নাই। এ কন্যার বিবরণ অতি অদ্ভুত। পিতামহ সাগ্রহে তাহা শুনিতে চাহিলে, মুকুট বলিতে লাগিলেন;—আমি কালনায় আপনাদের নিকট বিদায় লইয়া আর গৃহে যাই নাই। কেননা, গৃহে আমার আপন পরিজন কেহ ছিলনা। মাতা-পিতা আমার উপনয়ন দিয়া এক বৎসর মধ্যে পরলোক গমন করেন। আমি মাতুলালয়ে কয়েক দিন থাকিয়া, এক দিন রজনীতে কাহাকেও না বলিয়া প্রস্থান করিলাম। বাল্যাবধি তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অদ্ভুত ক্রিয়া সকলের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ও আসক্তি ছিল। সাধনা করিলে আমিও ঐ সকল রহস্য অধিকার করিতে পারিব বলিয়া মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল। শুনিতাম, দ্রাবিড় প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ও কামরূপ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে এ সকল বিদ্যায় পারদর্শী সিদ্ধপুরুষ আছেন। আমি একাকী কামরূপে যাত্রা করিলাম। তৎকালে ওসকল স্থান সুদুর্গম ও ভয়সঙ্কুল ছিল। কিন্তু "নিস্পৃহস্য তৃণং জগৎ"—কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ভয় কোথা? ভাবিয়া, মা জগদম্বাকে স্মরণ করিয়া একাকী নিঃসম্বল হইয়া যাত্রা করিলাম।

ভগবৎকৃপায় পথে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কামরূপে পঁহুছিলাম। দীর্ঘকাল বহু অনুসন্ধানে এক গুহাবাসী সিদ্ধপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রথমে কোনও ক্রমেই আমাকে শিক্ষা করিতে সম্মত হন নাই, কিন্তু আমার অবিচলিত সেবা ও দৃঢ়তা এবং ঐকান্তিক ভক্তিগুণে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইলেন। আমার মতিগতি আধিভৌতিক ব্যাপারেই আসক্ত দেখিয়া, তিনি বিবিধ ভূতযোনির ও সর্পব্যাঘ্রাদির বশীকরণাদি বিদ্যার গূঢ় রহস্য সমস্তই আমাকে শিখাইলেন। আমি তন্মনা হইয়া শিক্ষা করিলাম। ক্রমশঃ সে সকলের আশ্চর্য্য সফলতা প্রত্যক্ষ করিয়া, অবাক্ হইতে লাগিলাম। যে সকল কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, সে সকল যে উড়াইবার বিষয় নহে, তাহা জানিলাম। নিখিল-আশ্চর্য্য-সিন্ধু বিশ্বনাথের অনন্ত রহস্যময়, বৈচিত্র্যময় বিশ্বকাণ্ডে যে, কত অদ্ভুত, কত আশ্চর্য্য, কত অচিন্তনীয় ও অনির্ব্বচনীয় কাণ্ড, তাহা কে বলিতে পারে? এই আমাদের চক্ষের সম্মুখেই এক্ষণে হয় ত কত কি ঘটনা ঘটিতেছে, অথচ তাহার বিন্দুবিসর্গও আমরা জ্ঞাত নহি।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে একটী স্বধর্ম্মপরায়ণ ক্রিয়াবান্ প্রবীণতম হিন্দুর পরলোকগমন-সংবাদ প্রকাশ করিতেছি। ইঁহার নাম কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নিবাস খড়দহের সন্নিহিত রহড়া গ্রাম। ইঁহার বয়স ৭৩ বৎসর। ইনি দুই পুত্র, অনেকগুলি কন্যা ও বহুসংখ্যক দৌহিত্র দৌহিত্রী ও তাহাদের সন্তানাদির অভিভাবক ছিলেন। ইনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় কিছু দিন পড়িয়া বারাসত স্কুলে প্রাতঃস্মরণীয় ৺ রামতনু লাহিড়ী ও পুণ্যশ্লোক, মহাত্মা প্যারীচরণ সরকার, এই দুই স্বনামধন্য মহাত্মার নিকট ইংরাজি অধ্যয়ন করেন। অবস্থাগতিকে ইঁহাকে শীঘ্রই জীবিকার্জ্জনের জন্য বহির্গত হইতে হইল। কিছু দিন নানা কষ্ট ভোগ করিয়া অবশেষে লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করেন। তথায় তিনি নিজ বিদ্যা ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে স্বনামখ্যাত অতুলপ্রভাবশালী ৺ দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের স্নেহ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করেন। তৎকালে লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট সরকারে ও লক্ষ্ণৌ তালুকদারগণের নিকট মহাপ্রভাব দক্ষিণারঞ্জনের অতুল প্রতিপত্তি ছিল। বলিতে কি, সে সময়ে তিনিই এক প্রকার ঐ অঞ্চলের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারই বিশেষ অনুগ্রহে কেদারনাথ লক্ষ্ণৌ কলেজের লাইব্রেরিয়ান্ ও তত্রত্য সরকারী ছাত্রনিবাসের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হন। তিনি সপরিবার তথায়

দীর্ঘকাল বাস করিয়া নিজ সৌজন্যে, আতিথেয়তায় ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেন।

তাঁহার দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম,এ, ও কনিষ্ঠ শ্রীমান্ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল্। এই উভয় সন্তানকেই তিনি স্বতঃ পরতঃ অবিচলিত অধ্যবসায় ও কঠোর যত্ন সহকারে শিক্ষাদান করেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। এজন্য তাঁহার সকল কন্যাই সুশিক্ষিতা, সুশীলা, আতিথেয়ী ও পীড়িতের শুশ্রূষায় আশ্চর্য্য আত্মত্যাগিনী। ক্রমে তাঁহারই ঐকান্তিকী সাধনায় তাঁহার দুই পুত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শাস্ত্রে বলে, "যঃ সুপুত্রী স ভাগ্যবান্"। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"। বস্তুতঃ একালে যিনি সুপুত্রের পিতা, তিনিই সর্ব্বাধিক ভাগ্যবান্।

ইহাঁর শুভাদৃষ্টে দুইটী পুত্রই যুগল রত্ন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, কিছুকাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটীর পদ অতীব প্রশংসার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া এক্ষণে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মসচিবের (সেক্রেটরী) পদে প্রতিষ্ঠিত। অটল অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিলে এক সময়ে ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইবেনই। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুকৃতী শ্রীমান্ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল, কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ প্রিয়নাথের ন্যায় সুশীল, ধর্ম্মপ্রাণ, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের একান্ত আজ্ঞাবহ, সারধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, পরোপকারী সুপুত্র কলিযুগে সুদুর্লভ। ইনি থিয়সফি সমাজের ভক্ত। ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে গভীর সার সার কথা ইহাঁর নিকট যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহা অন্যের নিকট দুর্লভ। বিশেষতঃ পিতৃমাতৃভক্তি বিষয়ে ইহাঁকে রামচন্দ্র বলিতে ইচ্ছা করে। এ পরিবারের আতিথেয়তার কথা বলিয়া আশ মিটে না। জ্ঞাতি, বন্ধু ও অন্যান্য পীড়িত ব্যক্তিমাত্রেই এই পরিবারের মধ্যে আসিয়া প্রকৃত জননীর স্নেহ ও যত্ন লাভ করেন। আত্মীয়, বন্ধু, অতিথি-অভ্যাগতের সেবার জন্য ইহাঁদের গৃহে পাকযজ্ঞের বিরাম নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—অভ্যাগতগণের যখন যে অবস্থায় যে বস্তুটীর প্রয়োজন, তাহা ইহাঁদের নিকট জানাইতে হয় না। ইহাঁরা সকলের অন্তর্যামীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ তাহা সম্মুখে উপস্থিত করেন, এবং শিষ্টালাপে ও সৌজন্যে সকলকেই পুলকিত করেন।

কেদারনাথ অতিমাত্র পিতৃভক্ত। তিনি পিতার নামমাত্রেই ভক্তিভরে গদগদচিত্ত হইতেন। বিদেশ হইতে স্বদেশে আসিয়া স্বগ্রামে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও পূজা-মহোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

গৃহস্থালীর পরিচ্ছন্নতার ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে ও সকল কর্ত্তব্য ঠিক ঠিক সময়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পাদন বিষয়ে এবং সাংসারিক কার্য্যে শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য

বিষয়ে ইহাঁর বিলক্ষণ দক্ষতা ও আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশল ছিল। যাহা সুদূর ভবিষ্যতে সম্পাদন করিতে হইবে, তিনি তাহার সমস্ত আয়োজন ও নিয়মপ্রণালী পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিতেন। এজন্ত কার্য্যকালে কোনও বিষয়েরই অভাব থাকিত না।

ইঁহার স্বাস্থ্য বরাবরই খুব ভাল ছিল।

"খাইলে অশেষ ব্যাধি না খাইলে মার।
স্বল্পাহার স্বল্প নিদ্রা সর্ব্বকালে তরি।"

এই প্রাজ্ঞ-বাক্য তিনি যাবজ্জীবন পালন করিয়াছেন। ইদানীং স্বগ্রামের প্রতি তাঁহার প্রাণের অনন্ত তৃষ্ণা হইয়াছিল। কিসে গ্রামস্থ লোকগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়, কিসে স্বগ্রামে ৺ পিতৃলোকের অক্ষয় প্রীতিকামনায় শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ সমারোহে নির্ব্বাহ হয় এবং তদুপলক্ষ্যে দীনদরিদ্রেরা অন্নজলবস্ত্রাদি লাভ করে, কিসে গ্রামস্থ বালকেরা সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইয়া গ্রামের শোভা সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, ইহাই তাঁহার একান্ত চিন্তা ও চেষ্টা ছিল। তিনি কলিকাতা শিয়ালদহ কোর্টের অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অতি সুখ্যাতির সহিত নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের বিবাদ বিসংবাদ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মিটাইতেন। ছাত্রগণের কোনরূপ ত্রুটি দেখিলে, তিনি তাহা সংশোধনের জন্ত বিশেষ যত্ন করিতেন।

তাঁহার আর একটী অতীব প্রশংসনীয় অভ্যাস ছিল। সংস্কৃত শাস্ত্রের যথায় যে ভাল কথাটী স্বয়ং দেখিতেন বা কাহারও নিকট শুনিতেন, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিতেন। এইরূপে তাঁহার স্বহস্তলিখিত প্রাচীন গীতা, গাথা, শ্লোক, প্রবচন প্রভৃতি সমবেত করিলে, একখানি মহাভারতরূপে পরিণত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে যখন যে প্রবচনটীর আবশ্যক, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ মুখস্থ বলিয়া দিতেন। স্থানাভাবে অনেক কথা বলা হইল না। ৺ স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তকে ইনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। বলিতেন,—ওরূপ সহজ, ধার্ম্মিক, লোকহিতৈষী, ভগবদ্ভক্ত সাধু একালে দুর্ল্লভ।

হে ঈশ্বর! হে করুণাময়! হে মঙ্গলময়! ৺ কেদারনাথের পরার্থপ্রাণ, সৌজন্য-নিলয় পুত্র কন্যাদি সকলের প্রাণে তোমার সর্ব্বশোকহারিণী শান্তিসুধা বর্ষণ কর! এ ধার্ম্মিক পরিবারকে চিরনিরাময়, চিরজীবী ও চিরসুখী কর!

কোথায় সে জন ?

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

এইরূপে সত্যের অনুসন্ধানে শ্মশানে মশানে, শবাদি ব্যবচ্ছেদ করিয়া শ্রমণেরা ভ্রমণ করিতেন বলিয়া, হিন্দুগণ মহাদেবকে দেহতত্ত্বের অনুসন্ধানে শ্মশানে মশানে, শবাসনে ভ্রমণ করাইয়াছেন। সহস্র সহস্র বৎসরের ধূলি ও ছাই পাঁস ঠেলিয়া, সেই বৌদ্ধ ও শ্রমণগণকে সনক্ত করা বড় সহজ নহে। সহজ হউক বা কঠিন হউক, দেহতত্ত্ব ও সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হওয়ার একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের আমল হইতেই ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে।

ঔপনিষদিক ঋষিগণ যাহাকে "সত্য" বলিতেন, তাহাকেই "ব্রহ্ম" বলিতেন, "সত্যং ব্রহ্মেতি।" (বৃহদারণ্যক, ৫।৪।১ এবং ৫।২।)। উপনিষৎ যাহাকে ব্রহ্ম বলিতেন, বুদ্ধ ও বৌদ্ধগণ তাঁহাকেই সত্য বলিতেন।

জড়তত্ত্বের ভিতরেই আত্মতত্ত্ব, যেমন জড়ের ভিতরেই চৈতন্য,—জীবন,—জীব,—আত্মা। এই প্রকারে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান হইতেই জড়বিজ্ঞানের উন্নতি,—অধ্যাত্ম রাজ্যের সত্য হইতে জড়রাজ্যের সত্যও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই প্রকারে দেহতত্ত্বের ভিতরেই আত্মতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্বের ভিতরেই দেহ-তত্ত্ব রহিয়াছে। দেহে ও আত্মাতে যেমন জড়াজড়ি, দেহতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বে তেমনই জড়াজড়ি, একীভূত ভাব।

তাই দেখিতেছি "দর্শন" লাভ করিতে হইলে, দর্শন শিক্ষা করিতে হইলে, দেহতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কেবল বনে বনে, দেশে দেশে ঘুরিলে আর চলিবে না। সে দিন ও সে কাল আর নাই। আরণ্যক দিন চলিয়া গিয়াছে।

এখন যুগান্তর ঘটিয়াছে। সত্যযুগ আসিয়াছে। সত্য চিরদিনই পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া আছে,—

"দাও করতালি, জয় জয় বলি,
পূরিয়া অঞ্জলি, কুসুম লহ।
ঐ যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে,
উদিত অরুণ উষার সহ।"

সত্য নানা আকারে, নানা বর্ণে ফুটিয়া উঠিতেছে। জড়-সত্য,—অজড়-সত্য,—সামাজিক সত্য, রাজনৈতিক সত্য, কেহই আর ঢাকা থাকিবে না; কারণ এই যুগ সত্যের। তাই, ইহার নাম সত্য যুগ,—যে যুগে সত্য প্রচার হয়।

দেহবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, সকলই একবাক্যে শুধাইতেছেন —"কোথায় সে জন ?"

সকলেই কূল কিনারা হারাইয়া সংশয়-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন। সকলেই, বলিতেছেন,—"কোথায় সে জন ?"

কিন্তু যিনি দেহতত্ত্ব বুঝেন, তিনিই জানেন,—কোথায় সে জন ?"

দেহতত্ত্ব বুঝিতে যাইয়া বৈদিক ঋষিগণ, "কে ? কে ? কে ?" বলিয়া জগৎময় দৌড়িয়া বেড়াইয়া, শেষে ভাবিতে ভাবিতে, চিন্তারাজ্যে, দেহতত্ত্বের ভিতরে ঢুকিয়া মনের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের শেষ মীমাংসা পাইলেন। সেটি "কেন"—উপনিষদের প্রথম শ্লোকে ব্যক্ত।

প্রশ্ন ;—

কাহার দ্বারা ইচ্ছা ও মন প্রেরিত ?

কে প্রথমে দেহে প্রাণ যুক্ত করিলেন ?

কে বাক্‌শক্তিকে ফুটাইলেন ?

কোন্ দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে দেখাইলেন ও শুনাইলেন ?

উত্তর,—

যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, তাঁহাকে সেই বলিয়া জানিবে।

তাঁহাকে এইরূপে জানিলে, মানুষ ইহলোকেই, ইহলোক হইতেই অমৃত লাভ করিয়া যায়। (সামবেদীয়া কেনোপনিষৎ) ১—২।

অ-মৃত কি জান কি ? না-মরা। দেহ ক্ষয় হয়। আত্মা অক্ষয়। যেই পরিষ্কাররূপে বুঝি যে, আমি দেহ নহি, সেই সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি যে, আমি দেহের সঙ্গে জন্মাই না, তৎপূর্ব্বেও ছিলাম। কাজে কাজেই, পূর্ব্বে থাকিলে, পরেও থাকিব। তবেই মরণান্ত আমার জীবন,—তাঁহাতেই আমার জীবন।

আরও যখন বুঝি যে, দেহের অভ্যন্তরে কোনও কাজই আমার ইচ্ছানুযায়ী হয় না, তখনই বুঝি যে, অন্য কোনও ইচ্ছা ও শক্তি আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, মূলাধার হইতে সহস্রারে ও সহস্রার হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছেন। ভাল করিয়া "দর্শন" করিলে দেখি যে, নামমাত্র আমি আছি। সত্য সত্যই আছেন তিনি,—আর কেউ আমি নহি। তিনি অদৃষ্ট দ্রষ্টা,—অশ্রুত শ্রোতা, —অজ্ঞাত জ্ঞাতা,—অব্যক্ত বক্তা।

তখন প্রশ্ন অন্য আকার ধারণ করে।

"কোথায় সে জন, জানে কোন জন। যে জন সৃজন-পালন, লয় করে ?" না বলিয়া, তখন চিন্তাকুল হইয়া ভাবে,— "কোথায় আমি ?" আমি যে তখন যাই যাই,—নাই নাই হই! তিনিই আছেন আমার জীবনে, প্রাণে,—আমাকে রেখেছেন।

কোথায় সে জন ? দেখিবে ? প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, যিনি তোমাকে নিঃশ্বাসবান্ রাখিতেছেন,—প্রতি মননে, যিনি তোমাকে মনন করাইতেছেন,— প্রতি ভাবনায় যিনি তোমাকে ভাবাইতেছেন, তিনি তোমার ভিতরে —চক্ষুর প্রতি পলকে,—হৃদয়ের প্রত্যেক স্পন্দনে, —নরনারীর প্রত্যেক অঙ্গে,—প্রত্যেক জীবের জীবনে, আমাদের প্রত্যেক শোণিতবিন্দুতে জীবনীশক্তিরূপে, আত্মাশক্তিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। দূরে, নিকটে, অন্তরে, বাহিরে, হাসি ও কান্নায়, সূর্য্যে চন্দ্রে, জীব-জন্তুতে, স্থাবর জঙ্গমে,

জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে, "আঁখি মেলি দেখ যাকে, তিমিরে তিমিরহরা।" তিনি তোমাতে তিনি আমাতে, তিনি সর্ব্বত্র।

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

পারস্য কবি সেক সাদি।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

৩৬। খোরাসান দেশের কোনও রাজার ভীষণ পীড়া হওয়াতে গ্রীক্‌দেশীয় চিকিৎসকেরা রাজাকে কোনও যুবকের পিত্ত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। রাজা যুবকের পিতা মাতাকে ডাকিয়া অনেক ধন দান করিয়া, সন্তানের প্রাণনাশের সম্মতি পাইলেন। কাজি রাজার আরোগ্যের জন্য প্রজার রক্তপাত বৈধ, এই বলিয়া মৃত্যুর পরওয়ানা বাহির করিলেন। জল্লাদও উপস্থিত হইল। এমন সময়ে রাজা দেখিলেন, সেই যুবক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে যেন মনে মনে কি বলিতেছে। রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এমন অবস্থায় তাহার হাসিবার কারণ কি? সে বলিল—"সন্তান পিতামাতার চির-আদরের ধন; যদি সে সন্তানের প্রতি কেহ অন্যায় করে, তাহা হইলে পিতা মাতা কাজিকে জানায়, শেষে রাজা তাহার বিচার করেন। আমার পিতা মাতা সামান্য অর্থের লোভে আমাকে মৃত্যুমুখে দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; কাজিও আমার মৃত্যুর আদেশ দিয়াছেন এবং রাজার দৃষ্টি তাঁহার নিজের আরোগ্যের উপর। এমন অবস্থায় ভগবান্ ভিন্ন আর অপর সহায় নাই; এ অত্যাচারের কথা আর কাহাকে জানাইব? আপনার হস্তে কি আর আমার বিচারের প্রত্যাশা আছে? ইহা শুনিয়া রাজার অন্তঃকরণ করুণরসে দ্রবীভূত হইল ও তাঁহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"এই নিরপরাধ যুবকের রক্তপাত করা অপেক্ষা আমার মৃত্যু শ্রেয়স্কর।" অতঃপর রাজা যুবকের শিরশ্চুম্বন করিয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন ও প্রচুর ধন দিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। এই ঘটনার এক সপ্তাহ-মধ্যে রাজা স্বয়ং নিজ দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে ঈশ্বরকৃপায় আরোগ্য লাভ করিলেন।

৩৭। একদা তাব্রিজ নগরের একজন কবি সাদির সুখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সাদিকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" সাদি বলিলেন,—"আমি সুরম্য সিরাজ নগর হইতে আসিতেছি।" ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"হাঁ! তাব্রিজ নগরে সিরাজিরা এখানকার কুকুরের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক।" সাদি বলিলেন,—"ইহা ত আমাদের নগরের সম্পূর্ণ

বিপরীত; সেখানে তাব্রিজেরা কুকুরাপেক্ষা নগণ্য। তাব্রিজের কবি তৎপরে সাদির মস্তক কেশহীন দেখিয়া একটী গোলাকার বৃহৎ পাত্র দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা বলিতে পার—সিরাজিদের মস্তক এই মৃৎপাত্রের হাঁড়ির তলদেশের ন্যায় কেন?" সাদি বলিলেন,—"এই কারণেই তাব্রিজদের মস্তিষ্ক ঐ পাত্রের অন্তরের ন্যায় একবারে নিঃসার!"

৩৮। এক দিন নসিবারণ মৃগয়া করিয়া বনমধ্যে দগ্ধ মাংস খাইবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু লবণ না থাকায় নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রাম হইতে একটু লবণ আনিতে একজন পরিচারককে পাঠান হয়। নসিবারণ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, দেখ যেন লবণের যথোচিত মূল্য দেওয়া হয়,—কারণ যদি মূল্য না দেওয়ার প্রথা একবার আরম্ভ হয়, তাহা হইলে সমস্ত গ্রামটী অচিরে নষ্ট হইবে। অনুচরবর্গ জিজ্ঞাসা করিল—"এত অল্প বিষয় লইয়া কি অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা?" নসিবারণ বলিলেন,—"তিল হইতেই তাল হয়; অদ্য আমি যদি কোনও প্রজার বৃক্ষ হইতে একটী ফল লই, আমার প্রহরী ও কৃতদাসেরা শীঘ্রই সেই বৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করিবে অর্থাৎ বৃক্ষে আর ফল থাকিবে না, শেষে বৃক্ষটী কাষ্ঠের জন্য ছেদন করিয়া লইবে।

৩৯। যদি জ্ঞান লাভ করিয়া সৎকার্য্য করিতে চাও, কখনও উদরকে অতিভারগ্রস্ত করিও না। আকণ্ঠ ভোজন কর বলিয়া, তোমার বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হয় না।

৪০। হে ঈশ্বর! তোমার বিরুদ্ধে আর কাহার কাছে অভিযোগ করিব? তুমি ভিন্ন কি আর বিচারক আছে? তোমা অপেক্ষা কি কেহ পরাক্রমশালী আছে? তুমি যাহার পথ-প্রদর্শক, সে কিছুতেই বিপথগামী হয় না। তুমি যাহার মনে সন্দেহ উৎপাদন কর, কে আর তাহাকে পথ দেখাইবে?

৪১। কোনও সম্রাটের সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে, তিনি মন্ত্রীদিগকে পর দিবস প্রত্যূষে যে ব্যক্তি প্রথমে নগরে প্রবেশ করিবে, তাহাকেই রাজমুকুট ও রাজ্যশাসনের ভার দিতে বলিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। এই আদেশ অনুসারে মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গ পর দিন প্রাতঃকালে একজন ফকিরকে নগরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার হস্তে কোষাগার ও দুর্গ অর্পণ করিল। ফকির যাবজ্জীবন ভিক্ষান্নে উদর পূরণ ও শতগ্রন্থি কন্থায় দেহাবরণ করিয়াছিল—এখন রাজ্য পাইয়া পরম সুখে কিছু দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু অচিরে সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও দেশের আমির ওমরাও তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া, তাহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, তাহার শাসন হইতে অনেক প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজে নিজে অধিকার করিল। এই ঘটনায় ফকির মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল,—এমন সময়ে তাহার একজন বন্ধু আসিয়া

তাহার অভ্যুদয়ের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। ফকির বলিল,—"ভাই! এ অভিনন্দনের সময় নয়, আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ কর। যখন তুমি আমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলে, তখন আমি কেবল এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত ছিলাম, এখন আমার উপর এই রাজ্যের সমস্ত ভার ও ভাবনা পড়িয়াছে।" বন্ধু বলিল, "সময় মন্দ হইলে লোকে নানা কষ্ট পায়, আবার সম্পদে নানা বাসনার বশীভূত হয়। এই জীবনে কি বিপদ, কি সম্পদ—সকল অবস্থাতে মনের অশান্তি। ধনাকাঙ্ক্ষা করিলে লোকে কি করিয়া শান্তি পাইবে? পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছি, ধনাদি কোনও দান গ্রহণ অপেক্ষা দরিদ্রের ধৈর্য্যাবলম্বনই প্রশংসনীয়। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়া নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত হওয়া অপেক্ষা উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া শান্তচিত্তে জীবন যাপন করা শ্রেয়স্কর।

৪২। এক ব্যক্তির এক বন্ধু রাজমন্ত্রী হইয়াছিল। এই উচ্চ পদ পাইবার কিছু দিন পরে, রাজমন্ত্রীর কোনও লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি রাজমন্ত্রীর সহিত এখন আর দেখা কর না কেন? তোমাদের মধ্যে কি মনান্তর ঘটিয়াছে? না, তুমি তাঁহাকে আর পূর্ব্বের মত ভাল বাস না?" সে বলিল,—"ভালবাসিব না কেন? কিন্তু এখন তাহার কাছে যাইলে সে হয় ত রাজকার্য্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইতে পারে। যখন তাহার এ পদ আর থাকিবে না, তখন তাহার সহিত সহজেই দেখা শুনা হইবে। পদচ্যুত হইলে ও কষ্টে পড়িলে লোক বন্ধুর কাছে মনের কষ্ট প্রকাশ করে।"

৪৩। এক জনের চক্ষুরোগ হওয়াতে সে অশ্বচিকিৎসকের কাছে গিয়া ঔষধ চাহিল। চিকিৎসক অশ্বাদি পশুর চক্ষুরোগে যে ঔষধ সর্ব্বদা প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইত, তাহাই তাহাকে দিল। কিন্তু সেই ঔষধ ব্যবহারে সে ব্যক্তির চক্ষু অন্ধ হইল। সে চিকিৎসকের নামে বিচারকের নিকট অভিযোগ করিল। বিচারক বলিলেন, "ইহার আর কি প্রতিকার করিব? এ ব্যক্তি গর্দ্দভ, তাহা না হইলে অশ্ব কিম্বা গর্দ্দভ-চিকিৎসকের কাছে কেন গিয়াছিল?" এই উপাখ্যান হইতে এই নীতি শিক্ষা করা যায়, যে "গুরুতর কার্য্যে অপারদর্শী লোককে নিযুক্ত করিলে কেবল যে কার্য্যহানির সম্ভাবনা, তাহা নয়, জ্ঞানী লোকের নিকট অবিবেকী বলিয়া অপ্রতিভ হইতে হয়। যাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা আছে, এমন ব্যক্তি সামান্য লোকের উপর গুরুভার অর্পণ করে না। যে মাদুর বুনে, তাহাকে কেহ রেশমের সূক্ষ্ম কার্য্যে নিযুক্ত করে না।"

৪৪। এক ইমানের উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইলে, লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, পুত্রের কবরে স্মরণার্থ কি লেখা যাইবে? ইমান বলিলেন, "কোরাণ এত পবিত্র যে, তাহার কোন কবিতা এমন স্থলে লেখা উচিত নয়, যেখানে সে কবিতা সময়ে

বিলুপ্ত হইতে পারে, অথবা তাহার উপর মনুষ্যের পদবিক্ষেপ হইতে পারে, কিম্বা কুকুরে তাহা অশুচি করিতে পারে। যদি কিছু লেখাই নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহাই লিখ। আমি বলিয়াছিলাম, "বৎস! তুমি আমার আশালতা, তোমাকে পাইয়া আমার হৃদয়কানন কতই প্রফুল্ল হইতেছিল!" পুত্র কহিয়াছিল, —"পিতঃ! অপেক্ষা করুন, বসন্ত আসিলে আবার দেখিবেন, কবরস্থ আমার ধূলি হইতে কেমন সুন্দর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে।"

৪৫। একদা এক যুবক কোনও রাজকন্যার প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। যুবক সুন্দর, মিষ্টভাষী ও বক্তৃতাপটু, কিন্তু রাজপুত্রীর উপর তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিল। রাজকন্যা তাহার এই শোচনীয় দশার কথা শুনিয়া অশ্বারোহণে একদিন তাহার নিকট আসিল। যুবক রাজকন্যাকে দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল ও মনে মনে বলিতে লাগিল, —"যাহার প্রেমানলে আমি জর্জ্জরিত, সেই জনই আমার সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত। বোধ হয় আমার প্রতি তাহার কৃপা হইয়াছে।" এই ভাবে গদগদ হইয়া তাহার যেন বাগ্‌রোধ হইল, মুখে আর কোনও কথা সরিল না। রাজকন্যা দয়ার্দ্রচিত্তে যুবকের নাম কি, তিনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, কি করেন, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করিল, কিন্তু যুবক প্রণয়ে এত মুগ্ধ ও অভিভূত যে, কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যদি তোমার সমস্ত কোরাণ কণ্ঠস্থ থাকে, তত্রাপি রমণীর প্রেমে বিমুগ্ধ হইলে তোমার মুখ দিয়া তাহার একটী বর্ণও সরিবে না। শেষে রাজকন্যা অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, যুবক অবনত মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিল, "তুমি দয়া করিয়া আমার কাছে আসিয়াছ, আমার কত ভাগ্য! ইহার পর কি আর আমার মুখে কোনও কথা আসে? তুমি আমার সম্মুখে, অথচ এখনও আমি জীবিত আছি—এই আশ্চর্য্য!" এই কথা বলিতে বলিতে যুবকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। প্রিয়ার দর্শনমাত্রে যুবকের যখন এই দশা ঘটিল, তখন সে বাঁচিয়া কখনও সুস্থির হইতে পারিত না।

ভগবানে প্রেম এইরূপ হওয়া উচিত, কবি গল্পচ্ছলে এই উপদেশ দিয়াছেন।*

(ক্রমশঃ)

---

* আধুনিক কবি তারাকুমার কবিরত্নও এই কথা বলিয়াছেন!—

"মাতস্তব ধ্যানগতো যদাহং
ভূয়ান্ মদীয়ং মরণং তদৈব।
তদ্ধ্যানতশ্চেৎ মরণং মম স্যাৎ
ত্বং কি তদা শক্ষ্যসি মাং বিহাতুং॥
তোমারি ধেয়ানে যবে রূপ নিমগন,
জীবন আমার যেন যায় মা! তখন,
তোমারি ধেয়ানে যদি পারি মা! মরিতে,
তা হ'লে তুমি কি আর পারিবে ফেলিতে?"

প্রতিশোধ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

সেই সদাশয় ডাক্তারের রক্তপ্রদানের পর এক সপ্তাহ অতীত হইয়াছে। ডাক্তারের কথাই সত্য হইল। রক্ত-প্রদানের পর হইতেই ললিত সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে। পূর্ব্ব লাবণ্য ক্রমে ক্রমে দেহ অধিকার করিতেছে, কিন্তু শারীরিক দৌর্ব্বল্য এখনো যায় নাই। পিতার মুখে ডাক্তারের মহা-প্রাণতায় নিজের জীবনলাভের কথা শুনিয়া, সেই আত্মত্যাগী মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য ললিত বড়ই উৎসুক হইল। শারীরিক দুর্ব্বলতা অগ্রাহ্য করিয়া, পিতার নিষেধ সত্বেও অদ্য ডাক্তারকে দেখিতে ললিত চলিল। কাজেই শশাঙ্ক বাবুকেও সঙ্গে যাইতে হইল। পিতা-পুত্রে ডাক্তারের বাটী আসিলেন। বাটী প্রবেশ করিবামাত্র কেমন একটা অনিশ্চিত আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের ভৃত্যটী শুষ্কমুখে খবর দিল, ডাক্তার বাবুর ভারী অসুখ। পিতাপুত্রে দ্রুতপদে ডাক্তারের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়া শশাঙ্ক বাবু শিহরিয়া উঠিলেন। এই কি সেই সৌম্যমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন ডাক্তার? মৃত্যুর করাল কালিমা সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়াছে; সেই সদাহাসি মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে। চক্ষু মুদিয়া বক্ষঃস্থলে দুটী শীর্ণ হস্ত রাখিয়া একখানি পর্য্যঙ্কে ডাক্তার শুইয়া আছেন।

শশাঙ্ক বাবু কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "ডাক্তার বাবু!" ডাক্তার নয়ন উন্মীলন করিয়া উভয়কে দেখিলেন। সেই পাণ্ডুর মুখে একটু ক্ষীণ হাস্যের রেখা প্রকটিত হইল। তৎপরে উভয়কে ক্ষীণকণ্ঠে বসিতে বলিলেন, এবং ললিতকে মধুর সস্নেহ স্বরে বলিলেন, "ললিত বাবু! আপনি তবে বেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন।"

ললিত অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল, "ডাক্তার বাবু! আজ আপনাকে এমন অবস্থায় দেখিব এরূপ আশা করিয়া আসি নাই। আমি বুঝিয়াছি, আজ আমার পরিবর্ত্তে আপনি কেন রোগশয্যায়। এই হত-ভাগ্যের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ বিনিময় করিয়া, আপনি জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। জগৎ শত মুখে আপনার কীর্ত্তিগান করিবে; কিন্তু ডাক্তার বাবু!—"

হৃদয়াবেগে ললিত আর বলিতে পারিল না; অশ্রু আর চাপিতে না পারিয়া, অনেকক্ষণ কাঁদিয়া বলিল—"কিন্তু ডাক্তার বাবু! আমার কি প্রবোধ আছে? আপনি যে আজ আমার জন্য প্রাণ দিলেন, এ মর্ম্মান্তিক কষ্টের কি

সান্ত্বনা আছে! কিন্তু হায়! সে সময় যদি আমার বিন্দুমাত্রও জ্ঞানশক্তি থাকিত, তা হলে ডাক্তার বাবু! এ কার্য্য কখনই করিতে দিতাম না।"

ডাক্তার ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "কেন ভাই ললিত! তুমি ক্ষুন্ন হইতেছ? একটী কষ্টকর জীবনের পরিবর্ত্তে যদি একটী সুখময় বহুমূল্য জীবন রক্ষিত হয়, তাহাতে কাহার অপরাধ? ভাই ললিত! চন্দ্রমাশোভিতা শুভ্রজ্যোৎস্নাময়ী মধুরা যামিনী লোকের বেশি চিত্তরঞ্জক, না চন্দ্রহীন অমাবস্যার ভীষণ তমিস্রাপূর্ণ রজনী লোকের বেশি চিত্তহারক? ভাই! স্বর্গের সুরভি মন্দারকুসুম লোকের বেশি আকাঙ্ক্ষিত, না গন্ধহীন শিমুলপুষ্প মানবের বেশি প্রার্থনীয়? তেমনি ভাই! তুমি জগতের অনেকের আনন্দদায়ক। তোমাদ্বারা জগতের অনেক উপকার সাধিত হইবে, কিন্তু এ হতভাগ্য পৃথিবীর কোনও কার্য্যে লাগিবে না। আমাদের উভয়ের মধ্যে তোমার জীবনের মূল্য বেশি। তোমার জীবন অনেকের প্রার্থনীয়, অতএব তুমি ক্ষুন্ন হইও না।"

শোকবিকম্পিত কণ্ঠে ললিত বলিল, "ভাই! তুমি মনুষ্যের আকারে দেবতা, কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা করিও না। তুমি যদি জগতের কার্য্যে নাই, তাহা হইলে আমাকে বাঁচাইল কে? তোমার জীবন দুঃখময় কিসে?" "সে কষ্টকর কাহিনী শুনিয়া কাজ নাই।" ললিত বলিল, "সে কথার আলোচনায় তোমার কষ্ট হইতে পারে, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।" ডাক্তার বলিলেন, "না ভাই! আমার কষ্টের কথা বলি নাই। দুঃখে আমি চির-অভ্যস্ত। তোমরাই ব্যথিত হইবে বলিয়া—"

ললিত বিস্মিত নয়নে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া রহিল। শশাঙ্ক বাবু বলিলেন, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে বলুন, ললিতের বোধ হয় শুনিতে বিশেষ আগ্রহ হইয়াছে।"

ডাক্তার বলিলেন, "তবে শোন ললিত! এর জন্য যদি তোমরা পরে অনুতাপিত হও, আমায় কিন্তু দোষী করিও না।" পিতা-পুত্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন—ডাক্তারের কাহিনীর সহিত আমাদের সংস্রব কি?

"আমার নাম সুরেশচন্দ্র বসু। রায়পুর বাঘনাপাড়ার স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র বসু আমার পিতা।" শশাঙ্ক বাবু দুই হস্ত দূরে সরিয়া বসিয়া, নয়ন বিস্ফারিত করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "তুমি হরিশ বোসের ছেলে?" বৃদ্ধের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অজ্ঞান হইয়া হর্ম্ম্যতলে লুঠাইয়া পড়িলেন। ডাক্তার বলিলেন, "দেখুন ললিত বাবু! পূর্ব্বে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম, আপনারা শুনিলেন না, এখন তাহার বিষময় ফল ফলিল।"

ললিত বলিলেন, "সেজন্য ব্যস্ত হইবেন না, আপনি তৎপরের ঘটনাগুলি বলুন।"

ডাক্তার বলিলেন, "অগ্রে আপনার পিতাকে দেখুন।" ললিতের চেষ্টায় শশাঙ্ক বাবুর জ্ঞানসঞ্চার হইল।

ডাক্তার পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"বাঘনাপাড়া জমিদার শশাঙ্কবাবুর এলাকাভুক্ত। আমার পিতা সপরিবারে তথায় বাস করিতেন। আমার বয়স যখন চতুর্দ্দশ বর্ষ, তখন পিতা উদরাময় পীড়ায় অনেক দিন শয্যাগত ছিলেন। পিতা যা দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা হইতে জমিদারের খাজনা ইত্যাদি দিয়া যাহা থাকিত, তাহাতেই সংসার কষ্টে চলিত, কিন্তু তিনি শয্যাগত হওয়াতে সংসার একেবারে অচল হইয়া পড়িল। আমি তখন নিতান্ত বালকমাত্র। জমিদারের খাজনা ক্রমশঃ বাকী পড়িতে লাগিল। একদিন পিতাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য জমিদার-প্রেরিত দুইজন লাঠিয়াল উপস্থিত হইল। কিন্তু পিতা তখন উত্থান-শক্তি-বিরহিত, তাহারা মাতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। আমিও কাঁদিতে কাঁদিতে সঙ্গে চলিলাম। জমিদারের কর্ম্মচারীরা মাতাকে যথেষ্ট অপমান করিল। আমি মাতার স্বপক্ষে দুএকটী কথা কহিয়া জমিদারের ন্যায্য বিচারে পঁচিশ ঘা বেত্রাঘাত লাভ করিয়া রক্তাক্তদেহে গৃহে ফিরিলাম। আসিয়া দেখি, পিতার শেষ সময় উপস্থিত। মাতা দশ দিক্ অন্ধকার দেখিলেন। হঠাৎ সেই সময় জমিদারের দুইজন পাইক আসিয়া বলিল, "জমিদারের হুকুম, তোমরা এই মুহূর্ত্তে বাটী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাও।" মাতা তাহাদের অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন কথা শুনিল না। মাতা-পুত্রে পিতাকে একটী বৃক্ষতলে শয়ন করাইলাম। পর মুহূর্ত্তে পিতার পবিত্র আত্মা নরক পৃথিবী ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিল। আমার পিতৃবন্ধু রামলোচন বাবু, আমাদের বিপদ্‌বার্ত্তা শুনিয়া, পিতার যথাবিহিত সংকার করিয়া যত্নপূর্ব্বক মাতাকে ও আমাকে গৃহে স্থান দিলেন। কিন্তু কেন জানি না, আমরা কি দোষে জমিদারের বিষ নয়নে পতিত হইয়াছিলাম। তিনি আমার একমাত্র সুহৃদ্ রামলোচন বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি আমার জমিদারির মধ্যে বাস কর, অথচ আমি যাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, তুমি আমার প্রজা হইয়া কোন্ সাহসে তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়াছ ?"

জমিদারের শাসনবাক্যে রামলোচন বাবু ভয় পাইলেন না; তিনি আমাদের যেমন যত্ন করিতেন, তদপেক্ষা বেশী করিতে লাগিলেন। মাতা সব শুনিয়া ভাবিলেন,—অভাগিনীর জন্য জমিদারের কোপানলে পড়িয়া কেন একজন গৃহস্থের সর্ব্বনাশ হইবে? মা এক দিন কাঁদিতে কাঁদিতে গভীর রাত্রে আমার হস্ত ধরিয়া গৃহের বাহির হইলেন।"

ডাক্তার আর বলিতে পারিলেন না। অজস্র অশ্রুধারায় বদনমণ্ডল ভাসিয়া গেল। ললিতেরও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে আত্মসম্বরণ করিয়া ডাক্তার

বলিতে লাগিলেন, "অনেক কষ্টে কলিকাতার এক ভদ্র পরিবারে আমরা আশ্রয় পাইলাম। মাতা রন্ধন করিয়া মাহিনা স্বরূপ যাহা পাইতেন, তাহাতে আমার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। ক্রমে প্রবেশিকা ও এফে পরীক্ষায় যথাসময়ে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলাম। লেখা পড়া শিখিয়া কেরাণী বাবু সাজিতে আমার বড়ই ঘৃণা ছিল। একটা কিছু স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইতে বাসনা প্রবল হইল। ডাক্তারীর উপর আমার বরাবর কেমন একটা ঝোঁক ছিল। মাতার মত লইয়া ডাক্তারী শিখিতে লাগিলাম। যখন ডাক্তারী বিদ্যায় আমার সম্পূর্ণ পারদর্শিতা জন্মিল, যখন রোগিমহলে আমার হাতযশ প্রচার হইতে লাগিল, যখন সংবাদপত্রসমূহে আমার প্রশংসা ধরিত না, যখন অর্থে আমার দুই পকেট পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন—তখন একদিন ভাবিলাম, এইবার আমার দুঃখিনী মাতাকে লইয়া নূতন সংসার পাতিব; কিন্তু হায়! ললিত বাবু! আমার অভাগিনী মা হতভাগাকে ফাঁকি দিয়া পলাইলেন। সেই অবধি জীবনে বিতৃষ্ণা। সেই অবধি অর্থে ঘৃণা। আর কাহার জন্য অর্থ উপার্জ্জন করিব? যাঁহাকে সুখী করিব ভাবিয়াছিলাম, তিনিই যখন পলাইলেন, তখন অর্থ কাহার জন্য? সেই অবধি অর্থলিপ্সা ত্যাগ করিলাম। বন্ধু বান্ধবের অনুরোধে ডাক্তারী ছাড়িলাম না বটে, কিন্তু প্রাণ উদাস হইয়া গেল। এক জায়গায় দুদিন স্থির থাকিতে পারিতাম না। দেশবিদেশে ভ্রমণ জীবনের এক প্রধান কার্য্য হইল। মুঙ্গেরে অবস্থানকালে ঘটনাক্রমে আপনার পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে এক জন ডাক্তার জানিয়া তাঁহার বিপদের কথা বলিয়া আমাকে চিকিৎসা করিতে অনুরোধ করিলেন। আপনার পিতাকে আমি সেই মুহূর্ত্তেই চিনিলাম। নিমেষমধ্যে কাছারীবাড়ীতে মাতার অপমান, আমার বেত্রাঘাত, পিতার শোচনীয় মৃত্যু, রামলোচন বাবুর আশ্রয় দান এবং তথা হইতে বিতাড়িত হওন, মাতার পরগৃহে পাচিকাবৃত্তি অবলম্বন এবং তাঁহার পরলোকগমন, পরে পরে যুগপৎ আমার মনে সমস্ত ঘটনাবলীর উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইয়া উঠিল। ভাই ললিত! আমার সে প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে, আমি এখন সুখে মরিতে পারিব।"

স্তম্ভিত হইয়া ললিত সব শুনিল, তার পর আবেগভরে সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল,—"সুরেশ!—সুরেশ! ভাই সুরেশ! তোমার এই অপূর্ব্ব প্রতিশোধের কথা জগতের ইতিহাসে হীরক-অক্ষরে খোদিত থাকিবে। আমার নিষ্ঠুর পিতার অত্যাচারে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও নিজ প্রাণ দিয়া যে প্রতিশোধ লইলে এবং আমার পিতাকে যে শিক্ষা দিলে, ইহাতে যদি তাঁহার চৈতন্য

না হয়, ইহাতে যদি চিরজীবন অনুতাপে না দগ্ধ হয়, তাহলে তিনি মনুষ্যনামের অযোগ্য। আমি পুত্র, অধিক কি বলিব।" কিয়ৎক্ষণ নীরবে অবস্থানের পর ললিত বলিল, "কিন্তু ভাই! সেই ভীষণ ঘটনার সময় আমি নিতান্ত বালকমাত্র। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে যখন পিতার নিষ্ঠুরতা শুনিলাম, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমার অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কুত্রাপি তোমার সংবাদ পাই নাই।" সুরেশ বলিল, "ললিত! তুমি যে আমাকে ভালবাস, তাহা আমি জানি। সংবাদপত্রে তুমি আমার জন্য যে সকল বিজ্ঞাপন দিয়াছিলে, তাহা পড়িয়া তোমার স্নেহের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু এ মুখ দেখাইতে আর ইচ্ছা ছিল না। সেই জন্যই তুমি আমার সংবাদ পাও নাই।" ললিত সুরেশের দুটী শীর্ণ হস্ত ধরিয়া বলিল, "ভাই! আমার অপরাধী পিতাকে মার্জ্জনা কর।" অতি ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে ডাক্তার বলিলেন, "আমার স্বর্গীয় পিতা-মাতা করুন। আমি কে ভাই?" বলিতে বলিতে হঠাৎ সুরেশের জীবনী ক্রিয়া বন্ধ হইল। তাঁহার পুণ্যাত্মা জগৎপাতা জগদীশ্বরের পবিত্র অঙ্কে স্থান প্রাপ্ত হইল।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

মহানিদ্রা।

সুখেতে বিরাম লভ ঘুমাও হে প্রিয়তম!
শান্তিদাতা পিতৃকোলে করিছ বিশ্রাম॥
আমি পূজিতাম তোমা প্রেম-ফুল দিয়া।
তাই চলে গেলে হায়! কিছু না বলিয়া॥
থাক হোতা, সুখে থাক, দিব না ব্যাঘাত।
ভাঙ্গিতে ও মহানিদ্রা নাহিক যমের হাত॥
আমাদের মত আহা! কাঁদিতে না হবে।
বজ্রাঘাতে তথা নাহি পরাণ কাঁপিবে॥
যতদিন নশ্বরতা রহিবে দেহেতে।
যতদিন পঙ্কিলতা থাকিবে প্রেমেতে॥
ততদিন—ততদিন এ শ্মশানস্থান।
তার পরে শুভযাত্রা ক্লেশ-অবসান॥
নন্দনকানন হতে মোরে নেহারিয়া।
পার যদি মকরন্দ দিও হে ঢালিয়া॥
মৃত হতে অমৃতের পথেতে টানিও।
মরমের শোকজ্বালা মুছাইয়া দিও॥

স্বর্ণপ্রভা বসু।

সেফালি।

স্নিগ্ধ শরতের আভা মাখিয়া সেফালি।
ছদিনের মধুস্মৃতি প্রাণে রেখে গেলি॥
পিতৃহীনা হয়েছিনু শোকে অচেতন।
ও সৌরভ দিল প্রাণে নূতন চেতন॥

বজ্রাহত এ পরাণ তোকে বুকে লয়ে।
অশনির মহা জ্বালা ছিনু পাশরিয়ে॥
দেবতা-প্রসাদী ফুল সৌরভে মাতায়ে।
কেন আচম্বিতে গেলি শ্মশানে মিলিয়ে?
নিতা চাহি আনমনে ওই নীলাকাশে।
কুসুমকোরক-মালা যথায় বিকাশে॥
তুই হোথা ফুটেছিস সৌরভ জানায়।
মহাশোকে কত শান্তি পরাণে ছড়ায়॥
ধরণীর ক্লেশ-রাশি তোরে না ছুঁইল।
তিনি লইলেন তুলে যিনি শান্তিমূল॥
থাক ফুটে সুরধামে প্রাণের সেফালি।
তোদের দেবত্ব ভেবে ক্লেশ যাই ভুলি॥
দেখি না এ মর চোখে ক্ষতি তাহে নাই।
না ছুঁইল আবিলতা ভেবে শান্তি পাই॥

স্বর্ণপ্রভা বসু।

আব্রাহাম লিন্‌কন্।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত যুক্তরাজ্য বা ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌সের নাম এক্ষণে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র পরিচিত। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সম্মিলনে গঠিত বলিয়া ইহা সম্মিলিত বা যুক্তরাজ্য নামে অভিহিত। কেণ্টকী এই যুক্তরাজ্যের একটী বিভাগ বিশেষ। ইংরাজি ১৮০৯ খৃঃ অঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি কেণ্টকীর অন্তর্গত হার্ডিন্ নগরে আব্রাহাম লিনকনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম টমাস লিন্‌কন্। লিনকন্ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কোনও পূর্ব্ব বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যুক্তরাজ্যের অধিবাসিগণ এক্ষণে ধনে, জ্ঞানে এবং উদ্যমে পৃথিবীর সভ্যজাতিদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আব্রাহাম লিনকনের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন সেখানে বসতি স্থাপন করেন, তখন ইহার এরূপ অবস্থা ছিল না। সে সময় ইহা হিংস্র জন্তু-পরিপূর্ণ ছিল। অতি উগ্রপ্রকৃতি যুদ্ধপ্রিয় অসভ্য জাতিগণ তথায় বাস করিত। ইউরোপীয়গণ যুক্তরাজ্যে আপনাদিগের অধিকারস্থাপনের চেষ্টা করিলে, ইহারা স্বদেশের রক্ষার জন্য ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। সম্মুখযুদ্ধে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ না হইতে পারিয়াও ইহারা অনেক সময় অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিত। ইহাদিগের আক্রমণের ভয়ে ইউরোপীয়দিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। কিরূপ অবস্থায় যুক্তরাজ্যে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, আব্রাহাম লিনকনের পিতার শৈশবের নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

এক দিন টমাস লিনকন তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়ের সহিত কৃষিক্ষেত্রে গমন করেন। পিতার সহিত পুত্রগণ যখন কার্য্য করিতেছিলেন, সেই সময় একজন ইণ্ডিয়ান্ * একটী গুপ্ত স্থান হইতে

* কলম্বস আমেরিকায় উপস্থিত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ আবিষ্কার

টমাসের পিতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিল এবং সেই গুলিতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। অকস্মাৎ এইরূপ বিপৎপাত হওয়াতে টমাসের ভ্রাতৃগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং পিতার মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন। ষষ্ঠবর্ষীয় বালক টমাস অসহায় অবস্থায় পিতার মৃতদেহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সেই সময় একজন ইণ্ডিয়ান তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। দূর হইতে টমাস্‌কে শত্রুহস্তে পতিত দেখিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মরডিকাই স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ বন্দুক গ্রহণ করিয়া পিতৃঘাতী ইণ্ডিয়ানকে বধ করিলেন। বালক টমাস সেই অবসরে পলায়ন করিয়া জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিশ্চিত মৃত্যুহস্ত হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইলেন।

বালক টমাস কালক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, নান্‌সি হ্যাঙ্কস্‌ নামক কোনও মহিলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। টমাস্‌ নিজে বর্ণজ্ঞানহীন ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানিতেন। স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং স্বীয় পত্নীর নিকট যথাসম্ভব বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। টমাসের পত্নী স্বামী অপেক্ষা কেবল বিদ্যাবতী ছিলেন না, তাঁহার অপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণাও ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তিনি অতিশয় সাহসসম্পন্না ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে টমাস লিন্‌কনের একটী কন্যা ও দুইটী পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে কন্যাটী সর্ব্ব প্রথম। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে আব্রাহাম জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠটীর অতি শৈশবেই মৃত্যু হয়।

(ক্রমশঃ)

করিয়াছেন। তাৎকালিক পণ্ডিতগণেরও মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, বাস্তবিকই ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইজন্য তাঁহারা নবাবিষ্কৃত দেশকে ইণ্ডিয়া নাম দিয়াছিলেন এবং সেই হইতে সে দেশের অধিবাসিগণ ইণ্ডিয়ান্‌ নামে অভিহিত হইত। ইউরোপীয়দিগের ন্যায় আমেরিকাবাসিগণের বর্ণ শ্বেত ছিল না, রক্তাভ ছিল বলিয়া তাহাদিগকে রেড্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ বলা হইত।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা।

১। আমার অগ্রে অন্য কোনও দেবতা ভজনা করিবে না।

২। তুমি আমা ব্যতীত অন্য কোনও মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করিবে না।

৩। বৃথা ঈশ্বরের নাম লইও না।

৪। মনে রাখিও, স্যাবেথের দিনে পবিত্র থাকিতে হইবে।

৫। তোমার পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে।

৬। কখনও খুন করিও না।

৭। জীবনে কখনও কোনও ব্যভিচার করিও না।

৮। কখনও চুরি করিবে না।

৯। জীবনে কখনও প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিও না।

১০। অত্যন্ত লালসা পরিত্যাগ কর।

স্পঞ্জ।

স্পঞ্জ মানবের নিকট একটী অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ইহা বহু নরনারীর নিকট অপরিজ্ঞাত।

বালকবালিকাগণ লিখিবার বা অঙ্ক কসিবার সময় কালি বা অন্যান্য উপায়ে শ্লেট পরিষ্কার করিয়া থাকে, কিন্তু এই স্পঞ্জ দ্বারা পরিষ্কার করিলে বিশেষ সুবিধা হয়। স্পঞ্জ অনেক রকমের হইয়া থাকে;—ছোট, বড়, মোটা, চিকণ। অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই স্পঞ্জগুলি সমুদ্রের নীচে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহা সমুদ্রের তলদেশে পাহাড়ের উপর জন্মে। সাধারণ ব্যক্তির কল্পনায় স্পঞ্জ একটী জন্তুবিশেষ; কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট স্পঞ্জ একরকমের গাছড়া বলিয়া পরিচিত। কিন্তু স্পঞ্জ জন্তু কি কোনও গাছ, তাহা এখনও ভালরূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অধিকাংশ ব্যক্তিই ইহাকে জন্তু বলিয়া মনে করেন। স্পঞ্জ বড় নরম, এমন কি, ইহাকে কাপড়ের মত হাতের মুঠিতে ভরিয়া রাখা যায়। ইহাকে দেখিলে নরম জিনিষ বলিয়া মনে হয় না।

স্পঞ্জগুলির আকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের; কতকগুলি বাটির মত, কতকগুলি বলের মত, কতকগুলি ছোট ছোট গাছের মত। আবার অন্যান্য বস্তুর আকারেরও স্পঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। স্পঞ্জ যখন জন্মিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাতে কোনও ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় না; কোমল আঠার মত একটা কোমল মাংসবৎ জিনিষ দ্বারা ইহা পূর্ণ থাকে। ইহার বর্ণও বিভিন্ন ধরণের—কতক লাল, কতক সাদা কতক সবুজ, কতক হল্‌দে।

স্পঞ্জ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সমুদ্রের নীচে পাওয়া যায়। কোনও সময় অল্প জলের নীচেও পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় সমুদ্রের পঞ্চাশ বা ষাট ফিট জলের নীচে পাহাড়ের উপরে জন্মে। মানবগণ বিবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্পঞ্জ সমুদ্রের নিম্নস্থান হইতে উত্তোলন করিয়া থাকে। অল্প জলের মধ্য হইতে যখন স্পঞ্জ আনিতে হয়, মানুষেরা তখন বড় বড় নৌকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে যায় এবং বড় বড় লাঠির সঙ্গে আংটা লাগাইয়া স্পঞ্জ ছিঁড়িয়া আনে। স্পঞ্জ তুলিবার এটী অতি সহজ উপায়। কিন্তু গভীর জলের নীচে যে স্পঞ্জ জন্মে, তাহা বিভিন্ন প্রকারে তুলিতে হয়। ছয় জন কিম্বা

সাতজন লোক একখানি বড় নৌকা-রোহণে স্পঞ্জ যেখানে জন্মে, সেইখানে যায়। বলা বাহুল্য যে, এই ব্যক্তিগণের মধ্যে ডুবুরিও থাকে। তাহারা বড় বড় দড়ি আপনাদের কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধে ও আপনাদিগকে ভালরূপ ডুবাইবার জন্য বড় বড় প্রস্তর সঙ্গে লইয়া যায়। স্পঞ্জ রাখিবার জন্য বড় বড় "বাসকেট" ও সঙ্গে রাখে। ডুবুরিদের কার্য্য শেষ হইলে তাহারা আপনাদের কোমরে যে দড়ি বাঁধা থাকে, তাহা ধরিয়া খুব জোরে টানিতে থাকে এবং নৌকার উপরিস্থ ব্যক্তিগণ তাহাদের সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া সেই দড়ি ধরিয়া টানিয়া ডুবুরিদিগকে নৌকার উপরে তোলে।

ডুবুরিগণ সমুদ্রের নীচে প্রবেশ করিয়া একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা ভাল ভাল স্পঞ্জ কাটিয়া "বাস্কেটে" বোঝাই করিয়া রাখে এবং এই সকল কার্য্য অতি শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করে; কারণ একজন লোক দুই মিনিট কালের অধিক জলের নীচে থাকিতে পারে না।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

দিদিমার রূপকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নীলকমল।

রাত্রি পোহাইল। রাজা ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে জানালা খুলিয়া দেখেন যে, রাজবাড়ীর কেলে কুকুরটা রোয়াকের উপরে শুইয়া আছে। রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কাজে কাজেই সেই দিন সন্ধ্যাকালে বাজনা বাদ্য করিয়া কেলে কুকুরের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিলেন। রাজার মা শিবমন্দিরে পড়িয়া রহিলেন; রাণী কাপড় মুড়ি দিয়া শুইয়া কাঁদিতে লাগিলেন. শেষে বিবাহের গোল মিটিয়া গেলে পাইক পেয়াদাদিগকে গোপনে ডাকিয়া সেই কেলে কুকুরটাকে মারিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁর গায়ের জ্বালা অনেক জুড়াইল।

(৪)

রাজকন্যা প্রভাবতী আর হাসে না, খেলে না, গয়না পরে না, সই সাঙ্গাত, কারো সঙ্গে কথাও কয় না। রাজার যে মা সেই বুড়ী তাহা দেখেন আর ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদেন। শেষে বুড়ী একদিন সন্ধ্যাবেলা প্রভাবতীকে বলিলেন, চল্ বাছা, তোকে নিয়ে পালিয়ে যাই, এ নিষ্ঠুরের রাজ্যেতে আর থাকবো না।

অনেক রাত্রি হইল, লোকজন সব নিশুতি হইল, তখন নাতিনীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর মা চলিয়া গেলেন।

এক রাজার রাজ্য; সে রাজার রাজ্য ছাড়াইয়া আর এক রাজার রাজ্য। এমন-

তর কত রাজার রাজ্য ছাড়াইলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে রাজকন্যা প্রভাবতীর বড় জলপিপাসা পাইল। প্রভাবতীর জন্য ঠাকুরমা জল খুঁজিতেছেন, এমন সময়ে দেখেন,—সুমুখে প্রকাণ্ড মস্ত বাড়ী, চারি পাশে ফুলের বাগান, প্রাচীর দিয়া ঘেরা, সদরে মস্ত লোহার দরজা। কাক উড়িতেছে, চীল পড়িতেছে, অবশ্য পুকুর আছে। প্রভাবতী আগে, ঠাকুর মা পিছনে; প্রভাবতী যেমন বাড়ীর মধ্যে গিয়াছেন, অমনি ঝন্‌ঝনাৎ করিয়া লোহার দরজা পড়িয়া গেল। দুজনে দুই দিক্ হইতে দরজা ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন, দরজা খুলিল না। তখন দুই জনেই কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে ঠাকুর মা বলিলেন "বাছা! তোর কপালে যা' লেখা, তাই কর, আমি বাড়ী যাই।"

ঠাকুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। প্রভাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল।

বাড়ী তো বাড়ী, যেন স্বর্গপুরী। ফুলে ফুলে গাছ ভরিয়া আছে; কালো জল পুকুরে থই থই করিতেছে। বাঁধাঘাট। দালানের ভিতরে বৈঠকখানা সাজানো; নাইবার ঘর সাজানো, রান্নাঘর সাজানো, খাইবার ঘর সাজানো, কিন্তু জন মানব নাই। রাজকন্যা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন।

সেখানে গিয়া একটী ঘরে দেখিলেন, ঝাড় লণ্ঠন জলিতেছে; সোণার খাটে ফুলের বিছানা, মশারিতে হীরা মতির ঝালর পাত। সেই মশারির মধ্যে, সেই ফুলের বিছানায় এক যে রাজপুত্র শুইয়া আছেন, তাঁর রূপে ঘর আলো হইয়া আছে। প্রভাবতী অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন ঘুমন্ত রাজপুত্র কোন রকম সাড়া দিলেন না।

ক্রমে রাত্রি হইল। ঘরে লোক জন আসিতেছে বুঝিয়া প্রভাবতী খাটের নীচে লুকাইলেন। লোকজন আসিল, কত রকম রাজভোগ সোণার থালে রাখিল। সোণার গেলাসে জল, সোণার ডিবায় পান, আর আচমনের জন্য রূপার ডাবর রাখিল। ফুলে ফুলে ঘর সাজাইল। শেষে সকলে চলিয়া গেলে ঘরের দরজা ঝনঝনাৎ করিয়া আপনি বন্ধ হইয়া গেল।

সেই রাজপুত্র নীলকমল। বড়রাণী যেমনি গলার হার খুলিয়া শুইয়া পড়িল, অমনি নীলকমল বাঁচিয়া উঠিলেন, চোখ চাহিতেই রাজকন্যা প্রভাবতীকে দেখিলেন। তাহার রূপ দেখিয়া নীলকমল অবাক্ হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি দেবকন্যা?" প্রভাবতী বলিল— "না—আমি অমুক রাজ্যের অমুক রাজার কন্যা"। তখন দুজনের কাছে দুর্জনে সকল পরিচয় দিলেন।

রাজপুত্র সকল শুনিয়া বলিলেন,— "রাজকন্যে! ঠিক্ হইয়াছে, 'মরা বর, বিধবা কন্যা' আমারই অদৃষ্টলিখন। তুমি আমার সঙ্গে মাল্য বদল কর।"

তখন ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া দুজনে মাল্য বদল করিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেন।

(৫)

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায় নীলকমল দিনে মরিয়া থাকেন, রাত্রে বাঁচিয়া উঠেন, রাজকন্যা প্রভাবতীর সন্তানের লক্ষণ হইল।

তখন নীলকমল প্রভাবতীকে বলিলেন,—"আমি তো দিনে মরিয়া থাকি, তোমার খালাস হইবার সময়ে কেবা তোমাকে দেখিবে শুনিবে, কেবা যত্ন করিবে, কেবা দাই নাপিত ডাকিবে; অতএব তুমি আমার মা'র কাছে যাও। রাজবাড়ীর কানাচে ছোট কুঁড়েঘর, আমার দুঃখিনী মা সেইখানে থাকেন। তাঁর বড় দয়া—তুমি আসল পরিচয় দিও না—তাঁর শরণাগত হইলে তিনি তোমাকে প্রাণের মধ্যে রাখিবেন। শেষে খালাস হইয়া আসিও।"

স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া প্রভাবতী বাড়ীর বাহির হইলেন। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে ছোট রাণীর কুঁড়েঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ছোট রাণী মনের দুঃখে কারো সাথে কথা কন না। দুই হাতে দুগাছি শাঁখা, অঙ্গে সোণা রূপার কুচি নাই, ছেঁড়া কাপড় পরেন। তিনি চরকা কাটিতেছিলেন, এমন সময়ে প্রভাবতীকে দেখিয়া তার রূপে মোহিত হইলেন। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! তুমি কি কোনও দেবকন্যে?"

প্রভাবতী প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"মা! আমি বড় অভাগিনী। আমার স্বামী আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার কোনও কুলে কেহ নাই, আমি পাঁচ মাস গর্ভবতী, এ অবস্থায় কোথায় যাইব, এমন ঠাঁই নাই।"

ছোট রাণী উঠিয়া প্রভাবতীকে কোলে টানিয়া লইলেন; বলিলেন মা! "বিধাতা তোমার দুঃখ দুর করিবেন। তুমি আমার মেয়ে, আমি তোমার মা, তুমি আমার কাছে থাক।"

প্রভাবতী এক্ষণে ছোট রাণীর কাছে থাকিলেন।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। জাপানের কৃতিত্ব—জাপানীরা অধুনা প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান ও আবিষ্ক্রিয়াদি বিষয়েও অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। বিংশতিবর্ষবয়স্ক এম, টাচিবানা নামক জাপানী পণ্ডিত, মধ্য এসিয়া পরিভ্রমণপূর্ব্বক, নানা অরণ্য, মরুভূমি প্রভৃতি দুর্গম স্থান খনন করিয়া, বহুতর প্রাচীন দারুখোদিত হস্তলিপি ও তাম্রফলকাদি উদ্ধার করিয়াছেন। বড় বড় প্রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা ঐ সকল হস্তলিপি প্রভৃতি দর্শন

করিয়া বলিয়াছেন, এগুলি অমূল্য রত্ন, ইহাদ্বারা পুরাতত্ত্ববিষয়ে জগতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইবে।

২। আমরা গভীর শোকের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বঙ্গীয় পণ্ডিতকুল-ভূষণ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কা-লঙ্কার মহোদয় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ইনি ইদানীং গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃতকলেজ হইতে পেন্‌সন্ লইয়া গৃহে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রেই ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ঈদৃশ অমায়িক ও সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত বঙ্গদেশে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গদেশ আজি তাহার শীর্ষভূষণ পণ্ডিতরত্ন হারাইল। ইঁহার জন্য কোনও স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন একান্ত কর্ত্তব্য। ময়মনসিং জেলায় সেরপুর ইঁহার জন্মস্থান।

৩। আমাদের মাহাত্মা ছোট লাট মহোদয় সম্প্রতি কলিকাতায় ব্রহ্মবালিকা বিদ্যালয় ও বেথুন কলেজ পরিদর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং অনেকগুলি বালিকার অধীত বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা-দিগকে বিশেষরূপে উৎসাহ দান করিয়া-ছেন।

৫। ১৫ই জানুয়ারী, মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া পব্‌লিক হলে মহতী লোক-সভার সমক্ষে মান্দ্রাজ গভর্ণর কর্ত্তৃক স্বর্গীয়া পুণ্যশ্লোকা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। মাননীয় জষ্টিস্ কৃষ্ণস্বামী আয়ার উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। মান্দ্রাজের সুগুণবিলাসসভা কর্ত্তৃক উক্ত প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও উপহৃত হয়। সভাপতি বক্তৃতায় মহাপ্রাণা মহারাণী স্বর্গীয়া ভিক্টোরিয়া মাতার প্রজানুরাগাদি গুণ যথোচিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বামারচনা।

মৃত্যু।

১

ঢাকিয়াছে ধরাখানি ঘোর তমসায়।
রজনী আঁধার অতি,
নীরব নিস্তব্ধ ক্ষিতি,
মানব নিদ্রার ক্রোড়ে অচেতনপ্রায়।
নীরব বিহঙ্গকুল,
ভাগিরথী কুল কুল,
করে নাই স্তব্ধ এবে নিশি আগমনে।
এ হেন সময়ে শুনি,
কি গভীর বজ্রধ্বনি,
কাঁপাইয়ে ধরাতল উঠিল গগনে।

২

ছিন্ন নৈশ নিস্তব্ধতা
করিয়ে ওইরে কোথা,
হরিবোল" হরিবোল" প্রতিধ্বনি হয়।
জাহ্নবীর উপকূলে,
কার চিতা উঠে জ্বলে,

ধূ ধূ করে কার দেহ ওই ভস্ম হয়।
হায় রে কাহার আশা,
মায়া-মোহ-ভালবাসা,
এ ভবের লীলা খেলা সব সাঙ্গ হল।
এত প্রেম এত সুখ,
এত জীবনের দুঃখ,
ঐ চিতানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

৩

আবার উঠিছে রোল,
"হরিবোল" "হরিবোল",
কি আতঙ্কময় ধ্বনি পশিছে শ্রবণে!
কি যেন বিষাদময়,
আছে ও ধ্বনিতে হায়,
কোন সুখ যেন আর থাকে না পরাণে।
বিষম বৈরাগ্য-ভাব,
জাগে হৃদে অভিনব,
বুঝাইয়ে দেয় সবে ভব-অনিত্যতা।
চির জনমের তরে,
এমনি করিয়ে কিরে,
ফুরায় প্রাণের যত শান্তি ব্যাকুলতা।

৪

স্মৃতির সম্বন্ধটুকু,
পশ্চাতে পড়িয়ে শুধু,
থাকে কি অদৃশ্য আর হয় সমুদায়।
যে যায় সে চলে যায়,
আর নাহি ফিরে চায়,
আত্মাও তাহার ওই অনন্তে মিশায়।
আত্ম-বন্ধু-পরিবারে,
কাঁদিবে দুদিন তরে,
রবে না যাতনা কিন্তু চিরদিন প্রাণে।
আবার হাসিবে সবে,
রজনী প্রভাত হবে,
হাসিবে প্রকৃতি দেবী উষা-আগমনে।

৫

গাইবে বিহঙ্গকুল,
ঝঙ্কারিবে অলিকুল,
উদ্যান উজ্জ্বল করি কুসুম ফুটিবে।
গগনেতে পূর্ণশশী,
আবার উদিবে হাসি,
নিত্যই সৌন্দর্য্য নব ভুবন ভরিবে।
গিয়াছে জনম তরে,
আর না আসিবে ফিরে,
ঘুচিয়া কি গেল তার সুখদুঃখরাশি।
"আমার আমার" শব্দ,
হোল কি নীরব স্তব্ধ,
সংসারের স্নেহ দয়া কোথা যায় ভাসি?

৬

ঐ শেষ শোকভরা,
হরিধ্বনি ভয়ঙ্করা,
ঐ কি বিচ্ছেদ শেষ মানবের সনে।
ঐ ধ্বনি সাথে হায়,
সকলি কি চলে যায়,
ঢালিয়া অনলরাশি মানবের প্রাণে?
তবে রে অবোধ মন!
কেন এত আকিঞ্চন,
থাকিতে সংসারপাশে মোহের আগারে?
এসেছ ভবের হাটে,
দুদিনের তরে বটে,
কিন্তু সেই দয়াময়ে ভুলিছ কি করে?
ভুল না ভুল না মন,
চিন্ত তাঁরে অনুক্ষণ,
সুধাময় সুখ শান্তি পাইবে অচিরে।

শিক্ষাগুরু।

(স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে উপলক্ষ করিয়া।)

১

ভ্রাতৃবর! কোথা এবে রয়েছ এখন?
তোমার আশ্রিতগণ,
করিতেছে আবাহন,
আত্মীয় স্বজনগণ করিছে ক্রন্দন।

২

মহৎ দেবতা তুমি এ মহামহীতে
ছিলে ওহে মহাশয়,
দয়াময় স্নেহময়,
ভক্তিরসে ডুবি তোমা চিন্তিতে চিন্তিতে।

৩

চিনেছিলে তুমি দেব চৈতন্যস্বরূপে,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়,
জগৎ-জনার প্রিয়,
বাসব আসিয়াছিলে মানবের রূপে।

৪

এবে তুমি আছ সাধু সুমেরুর শিরে,
যেখানে সোণার ফুলে
সোণালী ভ্রমর খেলে,
সোণার শশাঙ্ক ফুটে স্বর্নদীর নীরে।

৫

দেবতার সনে তুমি দেবত্ব লভিয়া
রহিয়াছ দেবপুরে,
তা'কি আর বুঝে নরে,
কেবল তোমারে খোঁজে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।

৬

আমি কিন্তু দেখি তোমা যথা ফুলকুল
ফুলের পরাগগুলি,
মাথে মাথি তুলি তুলি,
শুনি তব স্বরে নদী করে কুল কুল।

৭

প্রভাকর প্রভাভরা নেহারি তোমারে,
চাঁদেও তোমারি রূপ,
হেরি আমি অপরূপ,
আলোতেও হেরি, হেরি গভীর আঁধারে।

৮

অন্তর ত হেরিতেছে হয়ে অন্তর্যামী,
দুর্ব্বলের দাও বল,
তুমি যে ভক্তবৎসল,
ভক্তশিষ্য আমি তব, শিক্ষাগুরু তুমি।

৺ দত্তমহাশয়ের স্মৃতি-সভার রিপোর্ট।

যিনি চতুর্দ্দশ বৎসরবয়স্কা, আজীবন পল্লীগ্রামে বর্দ্ধিতা এবং অশিক্ষিতা বালিকাকেও নিজ উচ্চ ধর্ম্মপ্রভাবের মধ্যে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য আজীবন পিতার অধিক প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে কোন যত্ন এবং চেষ্টাদি বাকী রাখেন নাই, তাঁহার সেই কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ, পুণ্যময় শুভ্র জীবনকাহিনী বিচূর্ণ প্রাণে জাগরিত হইয়া এ দীনার অপরিসীম ভক্তি এবং শ্রদ্ধা সেই কর্ম্মকোলাহলপূর্ণ, স্বনামধন্য মহাপুরুষের চরণমূলে উত্থিত হইতেছে, তাঁহার অমানুষিক দেবভাব ভাষার সাধ্য নাই যে ব্যক্ত করে।

জীবনের সেই মহাকালের আবর্ত্তনে

ডুবিয়া যখন বিহ্বল ও মৃত হইয়াছিলাম, যখন ভীষণ পরীক্ষার পর পরীক্ষা জীবনের দুর্ব্বল গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতেছিল, তখন সেই অনাথশরণের চরণে প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে এই প্রার্থনা উত্থিত হইত,—প্রভু! অবশ প্রাণ জীবিত রাখ। এমন কঠিন কাজে সতত নিযুক্ত রাখ, যাহাতে এই মরণের উপত্যকার শ্মশান-বহ্নি ভুলিয়া তোমার পথে কথঞ্চিৎভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারি।

যিনি আজীবন আমার ধর্ম্মগুরু এবং অকৃত্রিম প্রেমপ্রবণ সুহৃদ্ ছিলেন, তিনি নিয়ত আমার দিশাহারা, সন্তাপদগ্ধ হৃদয়কে কর্ম্মশীল করিতে প্রবুদ্ধ করিতেন।

দত্তমহাশয়ের স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য যৎকিঞ্চিৎ কার্য্য করিতে যে সমর্থ হইয়াছি, সেই প্রার্থনার ফল ভিন্ন রিপোর্টভাবে আমার বলিবার আর কিছুই নাই। স্বর্গগত মহাত্মার নিকট আমি মহাঋণে আবদ্ধ। তিনি আমার মত নগণ্য লোককেও আপনার মহোচ্চ ছাঁচে গঠিত করিবার জন্য যে অমানুষিক ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুধু দেবতাতেই সম্ভবে।

ধর্ম্মশিক্ষা-জ্ঞানচর্চ্চা হইতে প্রকাণ্ড সংসারধর্ম্মপালন, সন্তানগণের জ্ঞানধর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত, দুরন্ত শোক ও রোগের সময় পিতার অধিক স্নেহ-ধর্ম্মের সান্ত্বনা, সকলি আমি তাঁহার নিকট অপর্য্যাপ্তভাবে সুদীর্ঘকাল লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ডাকবিভাগের বহির্ভূত স্থানে ভ্রমণকালীন তাঁহার অমূল্য উপদেশপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্রাবলী অপ্রত্যাশিতভাবে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। নারীর এই প্রকার পরমহিতৈষী ভারতবর্ষে কয়জন জন্মিয়াছেন জানি না। তিনি নারী-জাতিকে পুরুষের উত্তমাঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তাহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে ভূষিতা করিয়া পুরুষের দক্ষিণহস্ত শান্তি-রূপিণীভাবে গঠিত করিতে আজীবন যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়া যে সকল ভারতনারী জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। পল্লীগ্রামবাসিনী সভ্যতার আলোক-বিবর্জ্জিতা মানকুমারী, নিস্তারিণী, গিরীন্দ্র-মোহিনী প্রভৃতি বিখ্যাত নারীগণের চরিত্রের প্রভাব কে অস্বীকার করিবেন? যিনি ভিখারীর বেশে, সংসারধর্ম্ম ভুলিয়া শুধু কর্ম্মকোলাহলে নিমগ্ন থাকিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কেনা বিমুগ্ধ হইয়াছেন?

তিনি ৪০ বৎসরের অধিক কাল দুহিতৃ-রত্ন বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করিয়া নারীদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে যে মহোচ্চ ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, স্বর্গগত মহাত্মার তাহাই অবিনশ্বর কীর্ত্তি, এমন কর্ম্মশীল জীবন, পূতজীবনের প্রভা যে অকস্মাৎ নিভিয়া যাইবে, স্বপ্নেও তাহা মনে হয় নাই।

তাঁহার স্বর্গারোহণের এক মাস পূর্ব্বে তিনি বসু মহাশয়ের মাসিক শ্রাদ্ধবাসরে উপাসনান্তে আমার সমক্ষে বামাবোধিনীর উন্নতিকল্পে অনেকগুলি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। হায়! কে জানিত সেই বিদায় তাঁহার শেষ বিদায় হইবে!

তাঁহার স্বর্গারোহণসংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র আমরা ১৯শে জুলাই ধর্ম্মতলা-ভবনে একটি শোক-সভা আহ্বান করি এবং স্বর্গগত মহাত্মার নামে একটী স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব হয়। আমার প্রতি অর্থসংগ্রহের কঠিন ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। যদিও দুই বৎসর হইল এই চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু বিষম শোক ও রোগে প্রপীড়িত হইয়া নানাস্থান পরিভ্রমণে ও শয্যাশায়িভাবে অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছি; অর্থসংগ্রহরূপ দুরূহ কার্য্যে অতি অল্প সময়ই নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যোগ্য হস্তে অর্থসংগ্রহ ভার অর্পিত হইলে যে অনেক বেশী অর্থসংগ্রহ হইতে পারিত, তাহার কোনই সন্দেহ নাই; তথাপি আমার অক্ষমতা সত্বেও যে পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা শুধুই ভগবানের কৃপা ও স্বর্গগত মহাত্মার ভক্তগণের সাহায্যের বলে। এমন দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অপ্রত্যাশিত ভাবে অর্থসাহায্য আসিয়াছে, যাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যজনক। প্রথম শোক-সভা আহ্বানের পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যাকালে হঠাৎ শোভাবাজার রাজবাটীস্থ ১৭ বৎসরবয়স্কা একটী রাজবধূ শাশুড়ীর প্রদত্ত জলখাবারের ২৫৲ টাকা আমার হস্তে অর্পণ করেন। পূর্ব্বে ঐ বধূদের সহিত আমার কোন আলাপ ছিল না। এরূপ স্থলে ঐ মহিলা যে বিশ্বাস পূর্ব্বক অপ্রত্যাশিতভাবে আমার হস্তে অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম এবং অর্থসংগ্রহ কার্য্য সম্পাদনার্থে আমার মনে নূতন বল আসিয়াছিল।

একখানা আবেদনপত্র পাইয়াই বর্দ্ধমানের মহারাণী অধিরাণী, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ইংলণ্ডপ্রবাসী মিসেস্ সেভিয়া প্রভৃতি সদাশয় মহাশয় ও মহাশয়াগণ মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করেন। মফঃস্বলবাসিনী মহিলারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানা লোকের নিকট হইতে আশাতীত অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে নারাণগঞ্জপ্রবাসিনী বিরজা মুখোপাধ্যায়, কাশীস্থ নিস্তারিণী দেবী, মিবারের সারদামঞ্জরী দত্ত, কুমিল্লার সুশীলাসুন্দরী গুপ্ত এবং কটকের শ্রদ্ধেয় মধুসূদন রাওর পত্নী এবং রাঁচি মহিলাসমিতির নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

একটী বিষয়ের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি। আমি পারিবারিক বিপদে জড়ীভূত হইয়া কলিকাতা হইতে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। দত্ত মহাশয়ের অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহা চাঁদা পাঠাইয়াছেন, যথাযথ ভাবে প্রকাশ্য পত্রিকায় স্বীকার করিয়াছি। তথাপি যদি কেহ ভ্রম প্রদর্শন

করেন, সন্তুষ্টমনে তাহা পূরণ করিয়া দিব। স্বর্গীয় মহাত্মা শিক্ষা দীক্ষা দান করিয়া যে ভারতমহিলাগণকে উন্নত করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা জীবনে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, বিজাতীয় প্লাবনে প্লাবিত ভারতবর্ষে ধর্ম্মের প্রভাব চিরোজ্জল রাখিতে যত্নশীল হইবেন। তাহা হইলেই পরলোকগত মহাত্মার কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষিত হইবে।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে,— সংগৃহীত অর্থের ভার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিয়া সার্ব্বভৌমিক ভাবে দুঃস্থ অবস্থায় পতিত নারীদিগের শিক্ষার সাহায্য করিবেন।

নির্ব্বাচনের ভার কতিপয় মহিলার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

অধিক আনন্দের বিষয়, তাহার অনুগামিনী হেমলতা রায় তাঁহার একখানি তৈল-চিত্র মেরীকার্পেণ্টার হলে স্থাপন করিবার ভার লইয়াছেন।

চাঁদাদাতাগণের তালিকা।

নাম ও ঠিকানা।	টাকা।
মহারাণী অধিরাণী, বর্দ্ধমান	২৫০
মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কাশিমবাজার, বহরমপুর	৫০
শ্রীমতী হেমলতা রায়	৫০
শ্রীমতী বিরজা মুখোপাধ্যায়, নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজ (সংগৃহীত)	৫৯
শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত	৩৪
„ সুশীলা সুন্দরী গুপ্ত, কুমিল্লা	৪০
„ সুশীলাসুন্দরী মিত্র, রাজবাটী, শোভাবাজার, কলিকাতা	২৫
„ নিস্তারিণী দেবী বেনারস	২৪
„ চারুলতা মুখোপাধ্যায়, বগুড়া	৩০
„ অম্বুজাসুন্দরী গুপ্তা	২০
শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও পত্নী (সংগৃহীত)	২২
রাঁচীর মহিলাগণ (সংগৃহীত)	২৬
শ্রীযুক্তা হেমাঙ্গিনী সেন, দেওঘর (সংগৃহীত)	১৫
শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মাদ্রাজ	২৫
Mrs. Sevier, London	২৫
শ্রীযুক্তা শিশিরকুমারী দত্ত, সুকিয়া ষ্ট্রীট	২৫
শ্রীমতী শৈলবালা রায়, বিডন ষ্ট্রীট	২৫
„ নির্ম্মলা সরকার, হ্যারিসন রোড	২৫
„ কিরণময়ী বসু, মোলাই চাবাগান, আসাম	২০
„ মৃণালিনী লাহিড়ী	২০
„ সুবালা আচার্য্য	১০
বেথুন কলেজ।	
„ কুমারী হেমপ্রভা বসু, এম, এ,	১০
„ কুমুদিনী দাস, বি, এ,	১০
„ সুরবালা ঘোষ, বি, এ,	১০
„ সুবর্ণপ্রভা বসু	১০
„ গিরিবালা সরকার	১০
„ কুসুমকুমারী মৈত্র	১০
„ মৃণালিনী বসু	১০
„ মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
„ কুমুদিনী বসু „ মৌবিন বর্ম্মা	১০

নাম ও ঠিকানা।	টাকা।
শ্রীমতী প্রভা আয়েঙ্গার, মহীশূর	১০
রায়বাহাদুর সিদ্ধেশ্বর মিত্র, বুন্দেলখণ্ড	১০
Sister Christint	১০
শ্রীযুক্ত স্নেহলতা দত্ত	১০
„ বিরাজমোহিনী দেব	৫
„ প্রেমলতা দেব	১০
„ চারুবালা ঠাকুর	১০
রায়বাহাদুর কালিকাদাস দত্ত, কুচবিহার দেওয়ান	১০
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ	১০
শ্রীমতী প্রমদা চৌধুরী	১০
„ কুন্দা চট্টোপাধ্যায়	১০
„ জ্ঞানদা মজুমদার	১০
„ বিভাবতী দে	১০
Mrs. সচ্চিদানন্দ সিংহ, এলাহাবাদ	১০
শ্রীমতী সুতারা দত্ত	১০
„ জগন্মোহিনী রায়, মধুপুর	৫
„ লাবণ্যপ্রভা সরকার	৫
„ পুষ্পমালা সেন	৫
Mrs G. C. Roy	৫
শ্রীমতী শকুন্তলা সেন	৫
„ মণিকা মহলানবিস	৫
„ রুক্মিণী মহলানবিস	৪
„ জগত্তারিণী মৈত্র	৪
„ মানকুমারী বসু, সাগরদাঁড়ী	৫
R. Vankuta	৫

নাম ও ঠিকানা।	টাকা।
শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র	৫
„ শান্তা মিত্র	৫
„ সুবালা সরকার	৫
„ নগেন্দ্রবালা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
„ সরোজকুমারী দেবী, সম্বলপুর	৫
„ সরোজিনী রায়	১০
„ সুলতা চট্টোপাধ্যায়	৫
„ বিমলা দাস	৫
„ সুদক্ষিণা সেন	৫
„ রমলা বসু	৫
„ স্বর্ণলতা দত্ত	৩
„ সরযূবালা সেন	৩
রামদুর্লভ মজুমদার, তেজপুর, আসাম	৫
শ্রীমতী পুণ্যলতা চক্রবর্ত্তী, পালামৌ	৩
„ সুখলতা রাও, কটক	৩
„ হেমন্তশশী সেন	৫
„ দীনতারিণী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর	৫
„ সরোজিনী রায়চৌধুরী, বাঁকা	৫
„ বিধুমুখী রায়চৌধুরী	৫
ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী	৫
শ্রীমতী সরলা দেব, দেরাদুন	৩
„ চন্দ্রমুখী মোমগাই (আনন্দকানন,) দেরাদুন	২

(ক্রমশঃ)

স্বর্ণপ্রভা বসু।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং অ্যাণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 558. February, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫৮ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩১৬। ফেব্রুয়ারী, ১৯১০। | ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রীজাতি বিষয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিক-প্রবর মহাত্মা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের অভিপ্রায়;—মিল বলিয়াছেন,—"ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই বিশাল কর্ম্ম-জগতে যত প্রকার গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ বিষয়কর্ম্ম আছে, সে সকলের সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ জমা, খরচ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার হিসাব নিকাসে ও সমীচীন তত্ত্বাবধানে এবং আয় ব্যয়-স্থিতি প্রভৃতির সামঞ্জস্য সংসাধনে, শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীগণ যেরূপ আশ্চর্য্য দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন, পুরুষজাতি তাহা পারেন না। তিনি দৃষ্টান্তরূপে আমেরিকার অসংখ্য শিল্পবাণিজ্যাদি বড় বড় কর্ম্মস্থানে স্ত্রী-জাতির কর্ম্মনৈপুণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতিকে বহুলরূপে এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু, "উপায়ং চিন্তয়েৎ প্রাজ্ঞস্তথাপায়ং চ চিন্তয়েৎ"—অর্থাৎ সকল বিষয়েরই দুই দিক্ দেখিয়া শুভাশুভের পরিমাণ স্থির করিয়া কার্য্য করা উচিত। য়ুরোপে চাকুরে স্ত্রীলোকের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, তত্রত্য লোকের গার্হস্থ্য ধর্ম্মের অবস্থা ততই শোচনীয় হইতেছে। সম্পূর্ণ পুংভাবাপন্না স্ত্রীজাতি বস্তুতই সমাজের অপাঙ্ক্তা। স্ত্রীজাতি সমাজের হৃদয়, পুরুষ মস্তিষ্ক। এ উভয়ের সমঞ্জসভাবে সম্মিলনই মানবসমাজকে রক্ষা করে।

সম্প্রতি শুভ মাঘোৎসব সম্পন্ন হইল। প্রধানতঃ ব্রাহ্মগণই সমাজ-সংস্কারে অগ্রণী। যাহাতে বিপথগামী যুবকগণের প্রকৃত সৎকর্ম্মে মতিগতি হয়, এ ধর্ম্ম-ক্ষেত্র আর্য্যভূমিতে ভদ্রসন্তান কর্ত্তৃক অনু-ষ্ঠিত নরহত্যা, দস্যুতা প্রভৃতি পৈশাচিক বীভৎস ব্যাপার এককালে বিলুপ্ত হয়, সে সকল বিষয়ে এ সময়ে বিশেষ সভাসমিতি ও আয়োজন একান্ত আবশ্যক। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, সর্ব্বসম্প্রদায়ের শিক্ষিত

ব্যক্তিমাত্রেরই সম্ভ্রমসমুথান ও রাজপুরুষগণের সহিত একাগ্রভাবে সমবেত চেষ্টা বিনা এ কার্য্য সাধিত হইবে না। যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে আব্রহ্মকীটাণু সর্ব্বজীবের তর্পণের ব্যবস্থা, যে জাতির হীনজাতীয়া নারীও, কেহ একটী কীটপতঙ্গকে হিংসা করিতে গেলে, বলিয়া উঠে, "আহা! কৃষ্ণের জীব! মারিও না।" যে দেশের শাস্ত্রীয় অনুশাসন,—

"বাস্যৈকং তক্ষতো বাহুং চন্দনেনৈকমুক্ষতঃ।
নাকল্যাণং ন কল্যাণং তয়োরপিচ চিন্তয়েৎ॥"

—যদি কেহ তোমার এক বাহুতে সুরভি-শীতল চন্দন লেপন করে এবং সমকালে অপরে তোমার অন্য বাহু কুঠার দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করে, তুমি এ উভয়ের মধ্যে একের কল্যাণ ও অপরের অকল্যাণ চিন্তা করিও না, সমকালে সমপ্রেমে উভয়েরই কল্যাণ কামনা করিও। যে দেশের ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ এ মহাপ্রেমের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, হায়! সে দেশের আর্য্যসন্তান বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও দস্যুতায় প্রবৃত্ত! হে মঙ্গলময়! জগদীশ! ভারতের এ কলঙ্ককালিমা শীঘ্র বিলুপ্ত কর! জয় জগদীশ হরে!

রেলগাড়িতে বোমা ও গুলি নিক্ষেপ প্রভৃতি উপদ্রব নিবারণ জন্য বারাকপুর ও তৎসন্নিহিত অধিবাসীরা মিলিত হইয়া, একটী সাধারণ সভার অধিবেশন করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার সভাপতি হইয়া স্থানীয় লোকগণকে এ লোমহর্ষণ অত্যাচার নিবারণ জন্য স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে উদ্যোগী হইতে বলিয়াছেন। বস্তুতঃ এ সকল ঘৃণিত পৈশাচিক অত্যাচার কদাচ সাধারণের অনুমোদিত নহে।

ট্রান্সভালস্থ ভারতবাসীর প্রতি কঠোর দুর্ব্যবহারের প্রতিবিধানার্থ সম্প্রতি আগ্রা ও এলাহাবাদে সভা হইয়া গিয়াছে। রেঙ্গুণে এজন্য যে সভা হইয়াছিল, তাহার প্রস্তাবগুলি বড়লাটের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন, যাহাতে ঔপনিবেশিকে ভারতীয় প্রজার প্রতি অত্যাচার না হয়, তিনি সে চেষ্টা করিতেছেন। দয়াময় ঈশ্বর করুন, যেন তাঁহার এ শুভ চেষ্টা অচিরেই সফল হয়। "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা"।

শুভ সংবাদ—শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ প্রমুখ নয়জন নির্ব্বাসিতের মুক্তিলাভ সংবাদে সকলেই পরম আহ্লাদিত হইয়াছেন এবং মুক্তকণ্ঠে লর্ড মিণ্টো মহোদয়ের উদারতার ও দয়ার জন্য তাঁহাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ দিতেছেন।

হিন্দু অনাথ বালকবালিকাদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য মুঙ্গেরে একটী অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপাততঃ একত্রিশটী অনাথ শিশু এই আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছে। রাজা, প্রজা উভয়েরই এই শুভানুষ্ঠানে সাহায্য করা উচিত।

সম্প্রতি ছারবঙ্গে তত্রত্য বাঙ্গালিরা সমবেত হইয়া একটী সভা করেন। বর্ত্ত-

মান উপদ্রব ও অশান্তির নিবারণ জন্য যাহাতে রাজপুরুষেরা এদেশীয়গণের সহিত সমপ্রাণে সম্মিলিত হইয়া চেষ্টা করেন, ইহাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য। ফলে রাজপুরুষগণ ও এদেশীয়গণের সমবেত যত্ন ভিন্ন এ বিপদের শান্তি নাই।

অদ্ভুত ঘটনা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতর পর।)

আমি কামরূপ হইতে পদব্রজে ভারতের বহু তীর্থ ও আশ্রমাদি পরিভ্রমণ করিয়া দেশে আসিলাম। আমার অনেকগুলি শিষ্য হইল। তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তি ও প্রণামী অর্থেই আমার এই দেবালয় প্রতিষ্ঠা, নিত্য দেবসেবা, অতিথিসেবা, দীনদুঃখীদিগের সাহায্য প্রভৃতি স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয়। প্রায় আট বর্ষ হইল, আমি একদা প্রবাসে শিষ্যালয়ে গিয়া তথা হইতে গৃহে আসিতেছিলাম। সঙ্গে নগদ টাকায় ও বস্ত্রালঙ্কারে প্রায় পাঁচ শত টাকা। কাল বৈশাখ, অপরাহ্ণ বেলা। আকাশে ক্রমশঃ মেঘাড়ম্বর দেখিয়া, দ্রুত পদে কোনও আশ্রয়স্থানের উদ্দেশে চলিলাম। মাঠ হইতে গ্রামসীমা অপূর্ব্ব দৃশ্য। অশ্বথ, বট, তাল, খর্জ্জুর, আম্র, কাঁটাল, বংশ প্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ উদ্যানসীমা বলিয়া জ্ঞান হয়। গ্রাম অদূরে জানিয়া আরো দ্রুতপদে চলিলাম। অনন্তর লোকালয় মিলিল। উক্ত গ্রামে কয়েক ঘর চাষি কৈবর্ত্ত এবং অধিকাংশ আগুরির বাস। দুই চারি ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তথা হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে আছে। তখন সন্ধ্যা উপস্থিত, অপরিচিত স্থান, অগত্যা সেই গ্রামের এক আগুরির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, গৃহখানি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন। কোথাও আবর্জ্জনার লেশমাত্র নাই। সদর দ্বারের দুই পার্শ্বে ভিত্তিসংলগ্ন উচ্চ ও প্রশস্ত মাটির মেজে। অন্দর হইতে বহির্ব্বাটীর বহুদূর পর্যন্ত গোময়মার্জ্জিত। বাটীর সম্মুখে সুন্দর তুলসীকানন। বিচিত্রবর্ণ ও নানাজাতীয় তুলসীবৃক্ষ, দর্শনমাত্র নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়। আহা! উহার শোভা ও সৌরভ কি প্রাণারাম! দেখিলে হৃদয়ে এক শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর, পবিত্র ভাবের উদয় হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণা, গ্লানি দূরে যায়। বোধ হয়, তুলসীর এই সৌন্দর্য্য ও অশেষ উপকারিতার জন্যই ইহাকে "বিষ্ণুপ্রিয়া" অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রিয়সামগ্রী বলিয়া থাকে।

উহা কোনও ধার্ম্মিক বৈষ্ণবের গৃহ স্থির করিয়া আহ্বান করিলাম। এক বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ আসিয়া গদ্‌গদভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, এবং করযোড়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাহার বয়স প্রায় অশীতি বর্ষ, কিন্তু তখনও দেহ ভগ্ন হয় নাই। তাহার সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত, কৌপীন বাস, গলে তুলসীমালা, হস্তে জপমালা।

বৃদ্ধ কথা কহিতে কহিতেও মালা ঘুরাইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে, "হরি হে তোমারি ইচ্ছা" ইত্যাদি কথায় নিজ দীনতা ও ভক্তি ব্যক্ত করিতেছে। সে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায়, আমি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলাম, আমার সঙ্গে টাকা ও অলঙ্কার আছে। দেখিতেছি, তুমি পরম সাধু। এ রাত্রি আমাকে আশ্রয় দান কর। বৃদ্ধ বলিল, ঠাকুর! আজি এ দাসের বড় ভাগ্য! তাই এস্থানে আপনার পদধুলি পড়িল। প্রভু! বাটীর মধ্যে আসুন! কোনও চিন্তা নাই। আপনার সেবা করিয়া চরিতার্থ হইব, বলিয়া বাটীর মধ্যে আমাকে লইয়া গিয়া আসনে বসাইয়া, স্বহস্তে আমার পদ প্রক্ষালন করিল, এবং একটী গৃহমধ্যে গালিচা পাতিয়া আমাকে বসাইল।

জানিলাম, ঐ বৃদ্ধের তিন পুত্র। দুইটী অবিবাহিত। জ্যেষ্ঠের বিবাহ হইয়াছিল, তাহার পত্নী একটী কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছে। কোনও প্রতিবেশিনী আত্মীয়া আসিয়া প্রত্যহ উহাদের পাকাদি কার্য্য করিয়া দেয়। বৃদ্ধের পুত্রেরা তখন ঘরে ছিল না। তাহারা সন্ধ্যার কয়েক দণ্ড পরে একে একে গৃহে আসিল। তাহারা আসিয়াই বৃদ্ধকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইল। অনন্তর তাহারা একটু আড়ালে গিয়া অনেকক্ষণ গোপনে কি মন্ত্রণা করিল। বৃদ্ধ বারংবার আসিয়া আমাকে পাক করিয়া আহার করিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আমি কহিলাম,—আমি একাহারী, রাত্রে একটু দুগ্ধ ও ফলমাত্র ভোজন করি। বৃদ্ধ তখন একবাটী দুগ্ধ ও ফলমূল আনিয়া দিল। ইত্যবসরে তথায় আর দুইটী অতিথি আসিলেন, তাঁহারাও নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। বৃদ্ধ তাঁহাদিগকেও সযত্নে অভ্যর্থনা করিয়া আমার সঙ্গে এক ঘরে স্থান দিল। তাঁহারাও পাক করিতে অনিচ্ছুক হওয়াতে, তাঁহাদের জন্যও দুগ্ধাদি আনীত হইল। তখন জলযোগ না করিয়া আমি শৌচাদি জন্য খিড়কীর ঘাটে গেলাম। শৌচান্তে ঘাটে হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতেছি, জনমানব তথায় নাই। তখন সন্ধ্যা অতীত, এমন সময় এক বালিকা বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া, ভয়-জড়িতকণ্ঠে আমার কাণে কাণে বলিল,—সর্ব্বনাশ! আপনারা মারা পড়িবেন, ইহারা ডাকাত। যদি কোনও কৌশলে পলাইতে পারেন, দেখুন। এ বাটীতে আসিলে কাহাকেও ফিরিয়া যাইতে হয় না। এ কথা যেন প্রকাশ হয় না, তাহা হইলে আমাকেও মারিয়া ফেলিবে। আমার মা একবার এক অতিথিকে গোপনে সতর্ক করায়, সে কৌশলে পলায়ন করে। আমার পিতা ও দাদা-মশাই তাহা বুঝিতে পারিয়া, আমার গর্ভিণী মাকে অতি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। বলিতে বলিতে বালিকার বাগ্‌রোধ হইল, দুনয়নে ধারা বহিতে লাগিল। সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইল।

ব্যাপার বুঝিয়াও আমি এরূপ নির্ব্বিকার ভাব ধারণ করিলাম যে, যেন ভয়ের

কারণ কিছুই জানি না। সেই গৃহমধ্যে প্রবেশিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গৃহের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সেই ঘরের সংলগ্ন আর একখানি ঘর আছে। উভয় ঘরের ব্যবধান একটী মৃত্তিকালিপ্ত বেড়ার দেওয়াল। দেওয়ালের এক স্থানে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা স্খলিত হওয়ায়, একটু ক্ষুদ্র রন্ধ্র হইয়াছিল। আমি গোপনে দীপালোকে সেই রন্ধ্রপথে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া দেখিতে লাগিলাম, পার্শ্বের ঘরে কি আছে, কেননা ঐ ঘর তালাবদ্ধ ছিল। যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমি এককালে স্তম্ভিত হইলাম! দেখিলাম, পাশাপাশি দুইটা ছিন্নমুণ্ড, রক্তাক্ত শবদেহ! বুঝিলাম—এ হতভাগ্যেরা বোধ হয় কল্য অধিক রাত্রে এ গৃহে অতিথি হইয়াছিল, রাত্রিশেষে হত হইয়াছে, এজন্য লাশ সরাইতে পারে নাই। অদ্য নিশীথে আমাদের সঙ্গেই ইহাদের সদ্গতি হইবে।

উপস্থিত বিপদ জ্ঞাত হইয়া ভাবিলাম, নবাগত এই দুই অতিথিকে এ কথা বলা উচিত কি না। বলিলে, ইহারা নিশ্চয় ভয় প্রকাশ করিবে, তখন দস্যুরা তৎপর হইয়া সেই দণ্ডেই আমাদিগকে সংহার করিবে। কিন্তু পূর্ব্বে একটু আভাস দিয়া, ইহাদিগকে সতর্ক করাও উচিত। ইহা ভাবিয়া অতি সাবধানে ও সঙ্গোপনে তাহাদের কাণে কাণে বলিলাম,—আমাদের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত। ইহারা দস্যু, প্রাণরক্ষার উপায় নাই। তবে যদি আপনারা বাগ্‌রোধ করিয়া নিঃশব্দে ও নিস্পন্দভাবে থাকেন, অণুমাত্র ভয়লক্ষণ প্রকাশ না করেন, তবে আমি সকলেরই প্রাণরক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু বিন্দুমাত্র ভয় প্রকাশ করিলেই প্রাণ হারাইবেন। এখন ভয় প্রকাশের সময় নয়। যাঁহার অভয় বাহু দশদিকে প্রসারিত, যাঁহার কৃপাণ যমমস্তকোপরি উদ্যত, যিনি বিপন্ন ভক্ত সন্তানের ভয়হরা, সেই অভয়া, বিশ্বজননী তারামাকে এসময় নিঃশব্দে ও একান্তভাবে ডাকিবার সময়। আর অধিক বলিবার সময় নাই। ইহা শুনিয়া সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণদ্বয় ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূন্য ও মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আমাদের জন্য আনীত ফলমূল ও দুগ্ধাদি সম্মুখে পড়িয়া রহিল, সে দিকে কেহই দৃষ্টিপাত করিল না। ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার গৃহস্বামী আসিয়া আমাদিগকে জলযোগের জন্য বিস্তর আকিঞ্চন করিল, কিন্তু আমি নির্ব্বিকার ভাবে কহিলাম,—আমরা অতিমাত্র ক্লান্ত, আহারে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তথাপি শেষ করিয়াও ইষ্টদেবতাকে নিবেদন করিয়া, যাহা পারি ভোজন করিব। তোমরা স্বচ্ছন্দে গিয়া শয়ন কর। আমাদের জন্য কোনও চিন্তা নাই। তোমার সৌজন্যে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আগন্তুকদ্বয় তখন মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া ঠিক শবদেহের ন্যায় পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, ভালই হইল। এ সময় ইহারা এ ভাবে না থাকিলে বিষম গোলযোগ ঘটিত।

আমি ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে

করিতে ধ্যানমগ্ন হইলাম। সম্মুখে দুগ্ধ ও ফল জল অস্পৃষ্ট পতিত। রাত্রি গভীর, কীটপতঙ্গের সাড়াশব্দ নাই। প্রকৃতি দেবী যেন সেই লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর ব্যাপার দেখিবার ভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রুদ্ধশ্বাসে অবস্থান করিতেছেন। আমি গৃহদ্বার কিছু পূর্ব্বেই রুদ্ধ করিয়াছিলাম। এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইতে লাগিল। আমি 'কে ?' জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর হইল,—শীঘ্র দ্বার খোল ! প্রয়োজন আছে। দ্বার খুলিলাম না। তখন বাহির হইতে দ্বারে প্রবলভাবে ঘন ঘন ধাক্কা পড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্বামীর ও তাহার পুত্রের,—"দ্বার খোল, শীঘ্র খোল ! নহিলে দ্বার ভাঙ্গিব ; আমার ঘর, আমার প্রয়োজন, তোমরা দ্বার খুলিবে না কেন ? তখন সে বৈষ্ণবচূড়ামণির আর সে ভাবাবেশে গদ্‌গদ, বিনয়মধুর কণ্ঠস্বর নাই, তাহা রক্তপিপাসু, ভীষণ শার্দ্দূলের বিকট গর্জ্জনে পরিণত। কয়েকটী ধাক্কা খাইয়াই দ্বার আপনি সশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল। দ্বারদেশে গৃহস্বামীর তিন পুত্র ও স্বয়ং গৃহস্বামী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান !

আমি তখনই হুঙ্কার ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। গুরুকৃপায় আমার বহুসাধনালব্ধ মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইল। অকস্মাৎ যেন প্রলয়-ঝটিকার বিক্ষোভে সমস্ত গৃহ মড়মড় শব্দে দুলিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে নানারূপ বিকটধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। আবার ক্ষণকাল পরেই সমস্ত নিস্তব্ধ। তখন ফিরিয়া দেখি, আগন্তুকদ্বয় এককালে সংজ্ঞাশূন্য। আমি বহুযত্নে তাঁহাদিগকে সন্ধান করিয়া বলিলাম,—কাজ মিটিয়াছে, পাপিষ্ঠেরা জীবিত নাই, এক্ষণে সাহসে বুক বাঁধিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করুন। আমি ইহাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিব। বলিয়া, আলোক-হস্তে বাটীর চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, বৃদ্ধ ও তাহার তিন পুত্র প্রচুর রুধির বমনপূর্ব্বক ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। দেখিয়া প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। হায়! তাহারা জানিত না যে, এ মহাপাপের পরিণাম এইরূপ ! সে দিকে আর না দেখিয়া, আমি সর্ব্বাগ্রে সেই প্রাণদাত্রী, দয়ার্দ্রহৃদয়া বালিকাটীর অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। বহুক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, সে শয়নগৃহেরই কোণে বস্ত্রাবৃতা পড়িয়া আছে, সংজ্ঞা নাই। আমি বহুযত্নে ক্রমশঃ তাহাকে সচেতন করিলাম। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া তুলিলে, সে কাঁপিতে কাঁপিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িতে লাগিল। শেষে অশেষ যত্নে ও নানা উপায়ে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা জানাইলাম। তাহাকে কোলে লইয়া বলিলাম - মা ! দেখিতেছি, তুমি বালিকা হইয়াও বেশ বুদ্ধিমতী। দস্যুগৃহে জন্মিয়াও তুমি দেবদুর্লভ দয়াগুণ অধিকার করিয়াছ। মা ! আমাদের সকলের মাথার উপর একজন সর্ব্বসাক্ষী আছেন। তাঁহাকে হরিই বল, শঙ্করই বল, মা বল, আর বাবাই বল, তিনি সর্ব্বময়, সকলের সকলি

তিনি। যে যাহা করে, যতই গোপন করুক, তিনি সকলি দেখেন, সময়ে তিনি পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের দণ্ড বিধান করিবেনই। নিশ্চয়ই এ হতভাগাদের পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল। দেখ মা! যে পাপিষ্ঠেরা শরণাগত, অসহায়, বিশ্বস্তচিত্ত অতিথিকে আশ্রয় দিয়া, নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে পারে, গর্ভবতী পত্নী ও পুত্রবধূকে হত্যা করিতে পারে, তাহাদের অকার্য্য কি আছে? তাহারা জীবিত থাকিলে, আরো কত শত লোকের প্রাণসংহার করিত। এ পৃথিবীতে আর তাহাদের থাকা উচিত নয়। ঈশ্বর যখন যাহা করেন, মঙ্গলের জন্যই। এজন্য ভক্তেরা তাঁহাকে সর্ব্বমঙ্গলা দয়াময়ী মা বলিয়া ডাকে। মা! এ ঘটনায় তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি কাঁদিও না। আজি হইতে আমি তোমাকে পিতামাতার অধিক যত্নে পালন করিব। যাহাতে তোমার ভাল হয়, তুমি সুখে থাক, আমি প্রাণপণে তাহা করিব। তোমার মতন ভাল মেয়ের এ ভয়ানক স্থানে থাকা উচিত নয়, তাই মা বিশ্বেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলা তোমাকে আজি এ ভীষণ স্থান হইতে উদ্ধার করিলেন। ঘটনা দেখিয়া অবশ্যই বুঝিতেছ, ইহা মনুষ্যের কার্য্য নহে। ভাবিয়া দেখ দেখি! আজি এ স্থানে দুইটী শরণাগত ব্রাহ্মণ অতিথির সহিত আমি হত হইলে, তোমার কোমল প্রাণে কিরূপ ব্যথা লাগিত! মা! তুমি আমার কাছে কিছুদিন থাকিলেই সকল শোক ভুলিয়া যাইবে। অহহ! পাপিষ্ঠেরা তোমার সে নিরপরাধা গর্ভিণী জননীকে কোন্ প্রাণে হত্যা করিল! এইকথা শুনিয়া, 'মা মা' বলিয়া মর্ম্মভেদী কণ্ঠে সে রোদন করিতে লাগিল।

আমি তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাহার হস্ত ধরিয়া বাহির হইলাম। আর দুইটী অতিথি সংজ্ঞালাভ করিয়া রাত্রি-শেষে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্ধান পাইলাম না। একাকী, অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই, আমি বাহির হইয়াছিলাম। বহুদূর গিয়া শেষে ভগবৎ-কৃপায় একস্থানে ডুলি ও বেহারা এবং খাদ্য মিলিল। কন্যাকে আহার করাইয়া ডুলিতে তুলিয়া গৃহে আনিলাম।

তদবধি আট বর্ষ কন্যাটী আমার কাছে আছে, আমার অবিচলিত স্নেহে ও যত্নে সে শোক ভুলিয়াছে। আমাকেই পিতা মাতা বলিয়া জানে। ছায়ার ন্যায় আমার কাছে কাছে থাকিয়া আমার আজ্ঞা পালন করে। বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্ম করিতে ইহার আদৌ ইচ্ছা নাই। নিতান্ত অনিচ্ছা জানিয়া আমি অধিক পীড়াপীড়ি করি নাই।

নিশ্চয় মা জগদম্বার ইচ্ছা, এ স্বর্গীয় জবাফুলটী চিরকাল তাঁহার চরণভূষণ হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বনাম বৃন্দা। যথাবিধি ইহাকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া ইহার নাম অন্নপূর্ণা রাখিয়াছি। আমার বিশ্বাস এই কন্যারই অহেতুকী, বিমলা, সরলা ভক্তির প্রভাবে এ গৃহে কিছুরই অভাব হয় না। যখন যত অতিথিই

আসুন, ইহার প্রদত্ত অন্ন-জলে ও পরিচর্য্যায় অতুল তৃপ্তি লাভ করেন। পিত্রাদত্ত আমার সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি আমার গৃহদেবতার ও অতিথি-অভ্যাগত দীনহীনগণের সেবায় উৎসর্গ করিয়া, এই কন্যাকেই যাবজ্জীবন ঐ সকলের একমাত্র কর্ত্রী করিয়াছি। আমি বহুযত্নে ইহাকে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে শিখাইয়াছি এবং ঈশ্বরস্তোত্রাদি পরিশুদ্ধরূপে পাঠ করিবার জন্য সামান্যরূপ সংস্কৃত শিখাইয়াছি। উষাকালে এই অমৃতকণ্ঠী কোকিলার সুধাস্রবিণী স্তুতিগীতি শুনিতে শুনিতে আমি লোমাঞ্চিতকলেবরে গাত্রোত্থান করি। প্রত্যহ মধ্যাহ্নভোজনের পর, এ পল্লীর নরনারী আমার দালানে সমবেত হইয়া, ইহার মুখে ভাষা রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি শ্রবণ করে। ইহার অমৃতকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত শ্রবণে পাষাণও বিগলিত হয়।

আমার পিতামহ সেই কন্যার অপূর্ব্ব কাহিনী জ্ঞাত হইয়া এবং তাহার সুধামাখা কথা, সঙ্গীত, স্তোত্রপাঠ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া ও তাহার অপার্থিব বিনয়মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে কোলে লইয়া অজস্র আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তথা হইতে বিদায় হইয়া শিবালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

পারস্য কবি সেখ সাদি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪৬। একদা এক চোর এক ফকিরের গৃহে প্রবেশ করিয়া চুরি করিবার কোনও দ্রব্য না পাইয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল। ফকির তাহা দেখিয়া, তিনি নিজে যে কম্বলের উপর বসিয়াছিলেন, তাহা এমন ভাবে চোরের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, যে, চোর তাহা সহজে দেখিতে পায় ও লইয়া যাইতে পারে। ফকির ভাবিলেন, যাহারা ঈশ্বরের পথের পথিক, তাহারা শত্রুরও মনে কখনও কষ্ট দেয় না। যখন শত্রুর প্রতি এরূপ ব্যবহার উচিত, তখন বন্ধু-বান্ধবের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করা কখনই ভাল নয়; তাহা হইলে মনের উন্নতির আশা করা যায় না। যে প্রেমিক, ও যাহার অন্তরে করুণা আছে, সে কাহারও অসাক্ষাতে কাহারও নিন্দা করে না ও তাহার সাক্ষাতেও তাহার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হয় না। এমন লোক অনেক আছে, যাহারা সম্মুখে মেষশাবকের ন্যায় শান্ত, কিন্তু পশ্চাতে মনুষ্যসংহারী সিংহের ন্যায় ক্রূর। যাহারা তোমার কাছে অন্যের কুৎসা করে, তাহারাই আবার তাহাদের কাছে তোমার নিন্দা করে।

৪৭। সুখ ও দুঃখের সমভাগী হইবার আশায় কতকগুলি ফকির ভ্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলে, আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে

চাহিলাম। তাহারা কিন্তু আমাকে তাহাদের দলে লইতে স্বীকার করিল না। আমি বলিলাম যে,—ফকিরদিগের এরূপ প্রত্যাখ্যান করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমি তোমাদিগের যথাসাধ্য সেবা ও সাহায্য করিব, তোমাদের গলগ্রহ হইব না, তবে তোমরা আমাকে কেন ত্যাগ করিতেছ? তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, —ভাই আমাদের ব্যবহারে দুঃখিত হইও না, আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। একজন চোর ফকিরের বেশ ধরিয়া একদা আমাদের সহিত মিলিত হয়। বাহ্যিক পরিচ্ছদ দেখিয়া লোক চেনা যায় না; পত্রে কি লেখা আছে তাহা লেখকই বলিতে পারে। ফকির সাধুই হইয়া থাকে। এই বিবেচনা করিয়া আমরা সেই ফকিরের বেশধারী লোকটীকে নিজদলভুক্ত করিলাম। জীর্ণবাসই ফকিরের পরিচ্ছদ, কিন্তু পবিত্রতা ও সাধুতা বস্ত্রবিশেষে হয় না। বাসনা ত্যাগ ও সংসার হইতে বিশ্লিষ্ট হওয়াই সাধুর সম্যক্ পরিচয়। বীর পুরুষের অঙ্গে লৌহাস্তরণ শোভা পায়। সে বেশ নপুংসক কিংবা ভীরুর উপযুক্ত নয়। যাহা হউক, সেই ফকিরবেশধারী লোকটীকে আমরা সঙ্গে লইয়া এক দিন বহু পর্য্যটনের পর এক দুর্গপ্রাচীরের নিম্নদেশে রাত্রি যাপন করিবার মানসে সমবেত হইলাম। আমরা সকলেই নিদ্রা যাইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সেই ছদ্মবেশধারী পুরুষ আমাদিগের নিকট হইতে একটী জলপাত্র চাহিয়া লইয়া বলিল, আমি সায়ংকৃত্য করিতে চলিলাম। পথে শীতার্ত্ত হইবে এই ভাবিয়া আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাহার কম্বাখানি সেই লোকটীকে দিল। সেই ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়াই দুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গ হইতে মহামূল্য রত্নপূর্ণ পেটিকা অপহরণ করিয়া পলায়ন করিল। দুর্গবাসীরা পরদিন প্রাতে আমাদিগকে লইয়া, আমরাই পেটিকা চুরি করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত করিয়া দুর্গমধ্যে আমাদিগকে অবরুদ্ধ করিল। সেই দিন হইতে আমরা কোনও অপরিচিত লোককে আমাদের দলে লই না। একজনের অপরাধে সমস্ত সম্প্রদায়ের অমর্য্যাদা ও অবমাননা হয়। তুমি ত ভাই! জান, একটী দুষ্ট গরুর জন্য গ্রামের সমস্ত গরুর দোষ হয়। ইহা শুনিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া মনে করিলাম যে, ফকিরগণ আমাকে দলভুক্ত না করিলেও আমি যথার্থ ফকির। আমি তাহাদের আখ্যায়িকা হইতে এই শিক্ষা করিলাম যে, একজন অবিবেকীর জন্য সম্প্রদায়ের অন্যান্য সকলেরই হানি হয়। গোলাপজলের পূর্ণপাত্র কুকুরে স্পর্শ করিলে পাত্রস্থ সব গোলাপজলই কলুষিত হয়।

৪৮। একদা এক ধর্ম্মযাজক রাজার অতিথি হইয়া ক্ষুধাসত্বেও স্বল্পাহার করিলেন। লোকে তাঁহার সাধুতার ভূয়সী প্রশংসা করিবে এই মনে করিয়া প্রার্থনার সময়ে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন। বাটীতে প্রত্যাগমন

করিয়া যাজক আহার করিতে চাহিলে, তাঁহার পুত্র কহিল,—পিতঃ! বোধ হয়, রাজধানীতে আপনার কিছুই আহার হয় নাই, অথবা অতি অল্প আহার করিয়াছেন। পিতা উত্তর করিলেন, হাঁ আহারের মতন আহার হয় নাই। পুত্রটী বুদ্ধিমান্, সে বলিল,—তবে পূজার মতন পূজা করুন অর্থাৎ আহার করিয়া যেমন আহারের ক্ষোভ মিটে নাই, পূজা করিয়া পূজার ক্ষোভ অগ্রে মিটাইয়া লউন। করপুট বিস্তার করিয়া ধর্ম্ম দেখাইয়া মনের অন্তরালে পাপ লুকাইলে কি হইবে? মেকী টাকা বিচারের দিন চলিবে না। তাহার জন্য যথার্থ সম্বল সংগ্রহ করুন।

৪৯। লেবানন্ পর্ব্বত হইতে একদা এক ফকির ডামস্কস্ নগরের প্রধান মস্জিদে প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ ও অলৌকিক কার্য্যকলাপের সুখ্যাতি আরবদেশে ব্যাপ্ত ছিল। তিনি হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য মস্জিদের নিকটবর্ত্তী সামান্য চতুষ্কোণ জলাধারের নিকট যাইয়া পা পিছলাইয়া তন্মধ্যে নিপতিত হইলেন ও বহু কষ্টে তাহা হইতে পুনরুত্থান করিলেন। ভজনা শেষ হইলে তাঁহার একজন সঙ্গী তাঁহাকে বলিল, মহাশয়! আমি ত আপনাকে সমুদ্রের উপর পদচারণ করিয়া যাইতে দেখিয়াছি, তখন আপনার পায়ে জল লাগে নাই। আজি অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ জলে পড়িয়া আপনার এরূপ দুর্দ্দশা হইল কেন? ফকির বলিলেন, যখন আমি ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া থাকি, তখন ঈশ্বরে ও আমাতে কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু সে অবস্থা বিদ্যুতের আলোকের ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থায়ী, পরক্ষণেই যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। মুহূর্ত্তমাত্রে আমি স্বর্গারোহণ করি, আবার পর মুহূর্ত্তে আমার পদতল পর্য্যন্ত দেখিতে অক্ষম হই। যাহার মন ঈশ্বরচিন্তায় চিরবদ্ধ থাকে, তাহার হস্তপদাদি প্রক্ষালনে প্রয়োজন থাকে না। সে আর ইহকাল পরকালের ধার ধারে না। সে ঈশ্বরে লীন হইয়া যায়। ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইলে আমাদের পদে পদে বিপদ্, পদে পদে এইরূপ পদস্খলন হয়।

৫০। এক দিন দেখিলাম, এক ফকির ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়া সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে কেহ নাই যে, তাহার সেবা শুশ্রূষা করে। ফকিরের যন্ত্রণার একশেষ, তথাপি সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কেন এত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ? ফকির বলিল,—আমি পাপে না পড়িয়া কষ্টে পড়িয়াছি, এই আমার পরম সৌভাগ্য ও সেইজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। সেই দয়াময় প্রাণারাম যদি আমার প্রাণ লইতেন, তাহা হইলেও আমি প্রাণের জন্য অণুমাত্র আকাঙ্ক্ষা করিতাম না। আমি কেবল এইমাত্র বলিতাম,—হে নাথ! আপনার চরণে আমার কোনও ত্রুটি হয় নাই ত ও সে জন্য আমার উপরে আপনি ক্রুদ্ধ হন নাই ত? কারণ তাহা হইলে আমি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইব।

৫১। কোনও ফকির, বিশেষ প্রয়োজন

হওয়াতে, তাহার বন্ধুর গৃহ হইতে একখানি কম্বল অপহরণ করিয়াছিল। কাজি বিচার করিয়া তাহার হস্ত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। ইহা শুনিয়া যাহার কম্বল, সে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বিচারককে ক্ষমা করিতে বলিল। কাজি বলিলেন,—আমি তোমার অনুরোধে আইনের বিপরীত কার্য্য করিতে পারি না। তচ্ছ্রবণে সে ব্যক্তি বলিল, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, তথাপি যদি কেহ ভিক্ষালব্ধ বস্তু অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার হস্তচ্ছেদ করা উচিত নয়। কারণ, ফকিরের কোনও বস্তুর উপরই অধিকার নাই। যাহা কিছু থাকে, তাহা পরস্পরের প্রয়োজনের জন্য। এই কথা শুনিয়া কাজি দণ্ডদান হইতে বিরত হইলেন ও সেই কম্বলাপহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন বন্ধুর গৃহ ভিন্ন পৃথিবীতে কি তোমার চুরি করিবার অন্য স্থান ছিল না?" সে বলিল, —"আপনি কি নীতিশাস্ত্রের কথা শুনেন নাই যে, বন্ধুর সর্ব্বস্ব লইবে, তথাচ শত্রুর নিকট ভিক্ষা চাহিবে না। সঙ্কটে পড়িলে নিজের দেহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে, বন্ধুর গাত্রের বস্ত্রখানি লইতে পার। কিন্তু এমন অবস্থায় শত্রুর কিছু লইতে হইলে তাহার গাত্রের চর্ম্ম লইবে।"

৫২। আমি একবার এক মস্‌জিদে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতেছিলাম, কিন্তু সমাগত শ্রোতৃগণের মধ্যে কেহই মন দিয়া শুনিতে ছিল না, তাহাদের অন্তঃকরণ পাষাণের ন্যায় কঠিন ও তাহারা সকলেই ঘোর বিষয়াসক্ত। অন্ধের সম্মুখে দর্পণ ধরা ও তাহাদের কাছে বক্তৃতা করা সমান। এই হতভাগ্যদের দশার কথা ভাবিতেছিলাম এবং মনে করিতেছিলাম, —প্রণয়িনী তোমাকে একান্ত ভালবাসিলে ও তোমার অবস্থা হইলেও তুমি তাহাকে না ভালবাসিতে পার। জগজ্জননীর ক্রোড় ত পতিত সন্তানের জন্য সর্ব্বক্ষণই প্রসারিত, কিন্তু সন্তান ক্রোড়ে না উঠিলে কে কি করিবে? আমি এইরূপ ভাবিতেছি, তখনও বক্তৃতা শেষ হয় নাই। এমন সময়ে দূর হইতে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম। সকলেই সেই কাতরোক্তিতে ব্যথিত হইল। সে ব্যক্তি আমার অল্প কথা দূর হইতে শুনিয়াই ওরূপ মোহিত হইয়াছিল। আমি তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম এবং ভাবিতে লাগিলাম যে, তাঁহার কি মহিমা! ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিলেও কেহ কেহ তাঁহাকে সম্যক্ বুঝিতে পারে। আবার অনেকে তাঁহার সান্নিধ্যেও ঘোর অজ্ঞানী হইয়া থাকে। [ভাগবতের যাজক ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদের বধূগণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।]

৫৩। আমি একবার কতকগুলি শান্ত-প্রকৃতি ও ধর্ম্মপরায়ণ যুবকের সহিত কোনও তীর্থে যাইতেছিলাম। পথে তাহাদের সহিত আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। আমরা মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরের নাম গাহিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গে একজন ফকির ছিল, তাহার কিন্তু এ সব কিছুই ভাল লাগিল না। সে কেবল ফকিরদের

নিন্দা করিতে লাগিল। ক্রমে আমরা একটী তালবনে প্রবেশ করিলাম। সেখানে এক কৃষ্ণকায় আরব বালক উপস্থিত হইয়া, এমন মধুরস্বরে গান গাইতে লাগিল যে, উড্ডীয়মান বিহঙ্গ মুগ্ধ হইয়া বৃক্ষশাখায় বসিল। সেই ফকির যে উষ্ট্রের উপর উপবিষ্ট ছিল, সেই উষ্ট্রও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এমন নাচিতে লাগিল যে, ফকির নাচে পড়িয়া গেল। তদ্দৃষ্টে আমি ফকিরকে বলিলাম,—সাধুজি! ভগবানের নামে পশুপক্ষীও বিহ্বল হইল, কিন্তু তোমার ত ভাবান্তর হইল না। বনের পাখী তোমার কাণে কাণে কি বলিল, তুমি কি শুনিতে পাও নাই? তুমি কি রকম মানুষ? প্রেম যে কি পদার্থ, তাহা কি তুমি জান না? দেখ! বালকটীর সঙ্গীতে উষ্ট্রও মুগ্ধ হইল। তুমি যখন এ সুখ অনুভব করিতে পারিলে না, তুমি নিশ্চয়ই পশু অপেক্ষা অধম। যাহা দেখিতেছ, যাহা শুনিতেছ সকলই সেই বিভুর অপার করুণা কীর্ত্তন করিতেছে। মধুমক্ষিকারা কেবল গোলাপ দেখিয়া গুন্ গুন্ করিয়া ভগবানের নাম করে। গোলাপের কণ্টকগুলিও শতমুখে সেই ভগবানের জয় ঘোষণা করে।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মচর্য্য।

"অথ যদ্ যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব।"

ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৮।৫।১-৩।

ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মলাভের উপায়, সত্যই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মচর্য্যই সত্যলাভের উপায়। সত্যসাধনের, সত্যবান্ হইবার অন্য উপায় নাই।

ইন্দ্রিয়চর্য্যার পথে চলিয়া চলিয়া, কেহ কখনও সত্যে উপনীত হয় নাই।

বিষয়ভোগ বড়ই প্রিয়। অতএব ভোগপথের নাম প্রেয়। যিনি প্রেয়কে চাহেন, তিনি শ্রেয় বস্তুকে লাভ করেন না।

বিষয়সুখ আপাতরম্য হইলেও অনিত্য। অতএব বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইলে, নিত্যসুখ লাভ হয় না।

ধর্ম্মের আচরণেই নিত্য সুখ লাভ করা যায়। অধর্ম্মের মধ্যে সুখ থাকিলেও তাহার পরিণাম অসুখ।

সত্য, ব্রহ্ম, ধর্ম্ম, নিত্য সুখ যদি চাহ, তবে অনিত্য সুখের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইবে,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে দমন করিতে হইবে। ইহারই নাম ব্রহ্মচর্য্য—সংযম।

ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন—পথ—যজ্ঞ। যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতেন। আমি বলি, ব্রহ্মচর্য্য কেবল ধর্ম্ম উপার্জ্জনের পথ নহে, উহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের লাভোপায়।

মনু বলেন,—

"ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেণ দোষমৃচ্ছত্যসংশয়ম্।
সংনিয়ম্য তু তান্যেব ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥"
(মনু ২ ৯৩)

ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতেই সকল দোষ ও কষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সকল সিদ্ধি লাভ হয়।

শাক্যসিংহ যজ্ঞে পশুবলির অবৈধতা প্রদর্শন করেন এবং ব্রহ্মচর্য্যমাত্রই যজ্ঞ, ইহাই সাধন ও প্রচার করেন। পশুহননে পশুপ্রবৃত্তি নিষ্ঠুরতা সাধন হয়,—মানুষ নিজেকে পশু হইতেও ভয়ানক পশুঘাতকে পরিণত করে।

শাক্যসিংহ বুঝিয়াছিলেন যে, যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার মানে মানুষের নিজের মধ্যে যে পশুভাব রহিয়াছে, তাহাকে বলি দেওয়া,—বিনাশ করা। কাম ক্রোধাদি পশুকে বলি দিতে হইবে। বেচারা ছাগকে বলি দিলে চলিবে না। আমাদের মধ্যে ছাগপ্রবৃত্তিকে বলি দিতে হইবে।

তিনি মারকে জয় করিয়াছিলেন। মার আর কে? যিনি মারেন। অর্থাৎ যার জন্য জীব মরে,—কাম। কামনাজনিত সুখ ক্ষণকালের জন্য। ঐ সুখ ভোগ করিলে, মানবের মন, হৃদয় ও আত্মা শারীরিক সুখের দাস হয়, বশীভূত হয়। নিত্য সুখের নহে, ক্ষণিকের সুখের জন্য আত্মাকে জড়ের অধীন, ক্রীতদাস করে,—আত্মাকে জড়ীভূত, মলিন, দুর্ব্বল করে। আত্মা স্বাধীনতা হারায়। যেই মুহূর্ত্তে, সেই ক্ষণস্থায়ী বিষয়সুখের কামনা মনে উদয় হয়, অমনি মন কুকুরের মত, তাহার পশ্চাৎ হিতাহিতবোধশূন্য হইয়া ধাবিত হয়। মন স্বাধীনতা হারায়,—স্বাধীনতার ইচ্ছা, চেষ্টা এবং ভাবও হারায়। কামনা যখন তখন গলায় দড়ি দিয়া কুকুরের মত টানিয়া লইয়া বেড়ায়। অতএব হে নিত্যসুখের প্রয়াসী মানব! সাবধান! কামনার আবর্ত্তে পড়িও না। কামনা বিষময় অমৃত। কামনা রিপুগণের দলপতি। এই দলপতির মাথা ভাঙ্গিয়া দাও, ক্রোধাদি পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে।

ব্রহ্মচর্য্য প্রধানতঃ এই দলপতি রিপুর,—আত্মার ধন হরণকারী তস্কর সকলের প্রধানকে বিনাশ করে।

যদি জীবন লাভ করিতে ইচ্ছুক হও,—যদি মৃত্যুকে জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে চাও, তবে শাক্যসিংহের মত চলিতে হইবে।

যদি অমর হইতে অভিলাষী হও, তবে মহর্ষি ঈশার মত বলিতে হইবে,—

"দূর হও! সয়তান! আমার সম্মুখে আসিও না; কাম!"

ব্রহ্মচর্য্য ব্যতিরেকে কেহ কখনও জীবনে কোনও মহৎ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সেই তত্ত্ব বুঝিয়াই পূর্ব্ব পূর্ব্ব হিন্দুগণ জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদেই ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতেন। হিন্দুগণের প্রাচীন আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম আশ্রম।

প্রথমে সংযম শিক্ষা করিয়া, তৎপরে যাহা করিবে, তাহাই হইবে। কৃপণ ব্যক্তি ব্যয়সংযম ও সুখ-ইচ্ছা সংযম না করিলে,

অর্থস্তূপ-নির্ম্মাণরূপ সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না। এই সংযম না থাকিলে, সৈনিক বিনাশসাধনকারী তোপের মুখে নিজের দেহকে উড়াইয়া দিয়া. কুরুক্ষেত্র, কুলঙ্গ, পোর্ট আর্থারের উপর বিজয় নিশান উত্তোলন করিতে পারেন না। সংযম না থাকিলে, ক্রুসবিদ্ধদেহে বিনাশকারীর জন্য ভগবৎসন্নিধানে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মানব অমরকীর্ত্তি উপার্জ্জন করিতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে, অর্জ্জুনের ন্যায় একলক্ষ্যে মৎস্যের চক্ষু বিধার মত, সত্যকে ও ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে পারা যায় না। ব্রহ্মকে ও সত্যকে নিউটনের মত ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বিদ্ধ করিতে হইবে।

মুণ্ডক উপনিষৎ বলিতেছেন,—

"প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥"
(২।২।৪।)

ওঁ ধনুক। আত্মা তীর। ব্রহ্ম শীকার। ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা অবিচলিত চিত্তে শর সন্ধান করিয়া, ব্রহ্ম শীকারের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে হইবে।

হে প্রিয়তম! তুমি কি এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা রামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ করিতে পারিবে, লক্ষ্মণের ন্যায় দৃঢ়মনে সিদ্ধি লাভের জন্য নিজের ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিতে পারিবে, ভীষ্মের ন্যায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইতে পারিবে, অর্জ্জুনের ন্যায় সব্যসাচী হইতে পারিবে এবং লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে? জীবন-অমৃত যদি লাভ করিতে চাহ, তবে ব্রহ্মচর্য্যকে আশ্রয় কর। আর মরণশীল বিষয়সুখের অনুরোধে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুর অধীন হইও না।

যদি জীবনকে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ করিতে চাহ, তবে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের পথে চলিও না। ব্রহ্মচর্য্যের পথে চল,—দুঃখ, দারিদ্র্য, জরা, রোগ, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত লাভ করিবে, নির্ব্বাণ লাভ করিবে,—সত্যকে লাভ করিবে—ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করিবে।

বেদ বল, বেদান্ত বল, পুরাণ বল, স্মৃতি বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল, সকলেই একবাক্যে, এই একই কথা বলিয়াছেন। যদি কথা না শোন, না মান, তবে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া কি ফললাভ হইবে? ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে আত্মার চিরযৌবনে পরিণত কর।

মরণশীল সুখের মধ্যে অমৃতসুখ আস্বাদন করিয়া ধন্য হও। পাপ মৃত্যু-সয়তান, কাল যেন তোমাদের ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতে না পারে। তোমরা অমর হও।

হে প্রিয়তম! তোমাদের মুখে ব্রহ্মচর্য্যের আনন্দ ও আলোক দেখিয়া, যেন আমাদের জীবনের সন্ধ্যাকালের অন্ধকার আশা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। "ওঁ ব্রহ্মরূপাহি কেবলং" পতাকা হস্তে লইয়া জীবন-সমরে অগ্রসর হও! ব্রহ্মাভরং বৈ ব্রহ্মাভরং!!!

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ।

দিদিমার রূপকথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ছোট রাণী প্রভাবতীর পঞ্চামৃত দিলেন। সাধ দিলেন। দশমাস দশদিনে প্রভাবতীর প্রসববেদনা হইলে দাই নাপিত ডাকিলেন। সোণার চাঁদের মত ছেলে হইল।

ছোট রাণী ষেটেরা করিলেন। ষষ্ঠী-পূজা করিলেন। ছেলে ছয় মাসের হইলে তার অন্নপ্রাশন দিলেন।

ছেলে ছয় মাসের হইলে এক রাত্রে প্রভাবতী নীলকমলের কাছে চলিয়া গেলেন। ছোট রাণী উঠিয়া কত খুঁজিলেন, কোথাও না পাইয়া শেষে কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে ছোট রাণী ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিলেন।

ছেলে দেখিয়া নীলকমল বড় আহ্লাদিত হইলেন। প্রভাবতীর কাছে মায়ের কথা অনেক করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শাশুড়ীর গুণের কথা বলিয়া প্রভাবতী কাঁদিতে লাগিলেন।

ছেলে দেড় বছরের হইল। নীলকমল বলিলেন, "রাজকন্যে! দিনে মরিয়া রাত্রে বাঁচিয়া আর কত কাল থাকিব? যদি পার, তবে বড় মা'র সেই হার আনিয়া আমাকে বাঁচাও।"

প্রভাবতী মনে মনে এক বুদ্ধি করিল। সকাল বেলায় নাপ্তিনীর বেশ ধরিয়া, ছেলে কোলে আল্‌তা চুপড়ী হাতে বাড়ীর বাহির হইল। শেষে রাজবাড়ীর অন্দরমহলে গিয়া ডাকিল,—"এয়ো স্বয়ো কে আল্‌তা পরবে গো! নূতন নাপ্তিনী এসেছে, আলতা কে পরবে গো।"

গরবিণী সুয়োরাণী পান খাইয়া আরনায় মুখ দেখিতেছিলেন। নাপ্তিনীর ডাক শুনিয়া ঝি চাকরকে দিয়া নাপ্তিনীকে ডাকিলেন।

ছেলে কোলে চুপড়ী হাতে নাপ্তিনী বাড়ীর মধ্যে গেল। ঝামা দিয়া পা ধুয়াইয়া প্রভাবতী আল্‌তা পরাইতে বসিল। বড় সুন্দর করিয়া বড় রাণীর ডাহিন পায়ে অল্‌তা পরাইল। শেষে গোপনে কোলের ছেলেকে চিম্‌টী কাটিতে লাগিল। ছেলে কাঁদিয়া খুন হইতে লাগিল। প্রভাবতী আল্‌তা পরাণো ছাড়িয়া ছেলে শান্ত করিতে উঠিল।

শান্ত করিতে গিয়া আরো চিম্‌টী কাটে, ছেলে আরো কাঁদে। বড় রাণী আল্‌তা পরিয়া বড়ই সুখী হইতেছিলেন, হঠাৎ আল্‌তা পরা বন্ধ হওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছেলে অত কাঁদে কেন বাছা?"

প্রভাবতী বলিল,—"ও কথা বোল্‌বো

কি মা? তোমার গলার ঐ হার দেখে ছেলে কাঁদচে।”

সেই হার নীলকমলের জীবনেরহার। বড় রাণী মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—“ও অনেক টাকার হার, ওকি ছেলে পিলের হাতে দেওয়া যায়?” অতীব বিনয়সহকারে প্রভাবতী বলিল,—“হার নিয়ে আমি কি কোরবো মা? আমরা গরিব দুঃখী লোক। তবে কিনা ছেলেটা বড় কাঁদ্‌ছে, আল্‌তা পরাতে দিলেনা।”

আল্‌তা পরিবার বড় আগ্রহ জন্য বড় রাণী গলা থেকে হার খুলিয়া প্রভাবতীর হাতে দিয়া বলিলেন, “সাবধান বাছা, হার যেন নষ্ট না হয়।”

প্রভাবতী ছেলের গলায় হার দিতে দিতে আবার চিম্‌টী কাটিল। ছেলে শান্ত হয় না। কেবল কাঁদে। তখন প্রভাবতী বলিল,—“মা! আমার সব জিনিব এখানে থাকুক, আমি ছেলেটাকে শান্ত করিয়া আনি”।

মুখের কথা না ফুরাইতে ফুরাইতে প্রভাবতী ছেলে কোলে করিয়া চলিয়া গেল। বড় রাণী কিছুক্ষণ তাহার প্রতীক্ষা করিয়া শেষে তাহাকে ডাকিতে দাসী পাঠাইলেন।

দাসী প্রভাবতীকে খুঁজিয়া পাইল না। বড় রাণী চিন্তিতা হইয়া চাকর পাঠাইলেন। চাকর ফিরিয়া আসিল। তখন বড় রাণী মাথা মুড়া খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রভাবতী আর আসিল না।

এ দিকে প্রভাবতী নীলকমলের কাছে গিয়া তাঁহার গলায় হার দিয়া দিলেন। নীলকমল বাঁচিয়া উঠিলেন। প্রভাবতীর বুদ্ধির কথা শুনিয়া তাঁহাকে “ধন্য ধন্য” করিতে লাগিলেন।

নীলকমলের মা ছোট রাণী কুঁড়ে ঘরের দুয়ারে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন, সেইখানে স্ত্রী পুত্র সঙ্গে লইয়া নীলকমল উপস্থিত হইলেন। ছোট রাণী প্রথমে অবাক্ হইয়া গেলেন। শেষে চিনিয়া “বাট্‌ বাট্‌” বলিয়া নীলকমলকে কোলে তুলিয়া নিলেন।

তিন জনে অনেক কাঁদিলেন। তিন জনে সকল কথা বলিলেন। শেষে ছোট রাণী রাজার কাছে খবর পাঠাইলেন।

রাজা আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বড় রাণীর উপরে আগুনের মত হইলেন। বড় রাণীকে তখনি বনবাস দিয়া ছোট রাণী, পুত্র, পুত্রবধূ আর পৌত্র লইয়া মনের সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

যা' কথা বনে
যখন বোল্‌বো তখন আসিস্ মনে।
আমার কথা ফুরালো
ন'টে গাছটী মুড়ালো।

শ্রীমা—

মহাপ্রাণা মহিলা।

সংসারে জীবিত ব্যক্তির গুণকীর্ত্তন করা অনেকেই অনুচিত মনে করেন। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন, —"যশ মৃতের পুরস্কার"। আমরা তাঁহার এ কথার অনুমোদন করিয়াও সময়ে সময়ে এরূপ নরদেবতা বা নারীদেবী দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিতে আমরা মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া পড়ি, এবং সে কথা অন্যের নিকটে প্রকাশ না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। সেই জন্যই সে দিন আমরা যে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি, আমাদের প্রিয় পাঠিকা ভগিনীদিগের অবগতির জন্য তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণপ্রভা বসু বামাবোধিনীর পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেরই পরিচিতা। সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী চারি বৎসর পূর্ব্বে ধার্ম্মিক, সাধু, মনস্বী, যশস্বী, কৃতী, কীর্ত্তিমান্ এবং একান্ত প্রেমাস্পদ পতিরত্ন হারাইয়া জীবন্মৃতা হইয়া আছেন। কিন্তু উহাই তাঁহার ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত নহে— তাঁহাকে আরও ভীষণ পরীক্ষা দিতে হইতেছে। পতিবিয়োগের অল্প দিন পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটী ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন; এবং বর্ত্তমান বৎসরে গত দেড় মাসের মধ্যে তাঁহার দুইটী কন্যা অমরধামে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই কন্যাগণ শতদলকোরক তুল্য; ইঁহারা রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশীলতা, অমায়িকতা ও চরিত্রের মধুরতায় দেববালাসদৃশী ছিলেন। আমাদের কথা একটুও অতিরঞ্জিত নহে। এ বিষয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমরা মাননীয়া বসু মহাশয়ার আশ্রমে গিয়াছিলাম। তখন তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কুমারীটী পনর কি কুড়ি দিন ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর একটী কন্যা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা রহিয়াছেন!—ভীষণরোগে তাঁহার নবনীততুল্য তরুণ দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে! সে রোগীর অবস্থা কখন কি ঘটে, আত্মীয়বন্ধুগণ সশঙ্কচিত্তে তাহাই চিন্তা করিতেছেন, আর তাঁহার ভগ্নপ্রাণা শোকসন্তপ্তা মা? আমাদের সহৃদয়া ভগিনীগণ তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা মনে মনে অনুভব করুন।

আমরা দেখিয়া মরমে মরিয়া গেলাম— হায়! জগতের মধ্যে যাঁহাকে প্রকৃত সৌভাগ্যবতী বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, আজি তাঁহার এই বৈধব্যবেশ, তাঁহার এই সকল শোকসন্তাপ আবার আমাদিগকে দেখিতে হইল! মানবভাগ্য এমন ক্ষণভঙ্গুর, এমন প্রতারক। হায়, হায়! তবে সৌভাগ্যের জন্য, যশের জন্য, ধনের জন্য—পার্থিব আসক্তির জন্য আমরা প্রাণপণ করি কেন?

কিন্তু যাঁহার জন্য হৃদয় এত কাতর হইতেছিল, সেই কোমলপ্রাণা, দীনবেশা, অশ্রুমুখী দেবীকে কি দেখিলাম?—দেখিলাম তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, তাঁহার চিত্তের স্থিরতা, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান, তাঁহার আত্মসংযতি এ মর জগতে অতুলনীয়। দেখিলাম, তিনি আমাদিগকে প্রেমালিঙ্গন দিয়া প্রাণের প্রাণে গাঁথিয়া লইলেন; দেখিলাম, তিনি সেই রোগক্লিষ্টা মুমূর্ষু কন্যাটিকে কেমন সান্ত্বনা ও আশ্বাসবাণী শুনাইলেন; দেখিলাম, তিনি স্বর্গীয় বামাবোধিনী-সম্পাদক মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাবিষয়ক আলোচনা করিলেন; আর দেখিলাম, তিনি জলন্ত বিশ্বাস এবং একান্ত ভক্তি-ভাবে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সে প্রার্থনায় তিনি কি চাহিলেন—মুমূর্ষু সন্তানের জীবন? তাহা নহে। পার্থিব কোনও সুখ? তাহাও নহে। তিনি চাহিলেন, আরো শক্তি, আরো বিশ্বাস, আরো ভক্তি। তাঁহার একটী বিবাহার্থিনী কন্যাকে * বিবাহ বিষয়ে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় কত সদুপদেশ দিলেন! আমরা দেখিলাম, শিশু যেমন স্নেহময়ী মাতার প্রহার সহিয়া, মায়ের স্নেহ চিনিয়া আবার সেই মা'কেই জড়াইয়া ধরে, বিশ্ব-জননীর ভীষণ পরীক্ষায় সন্তপ্তা এই দেবীও তেমনি প্রাণের প্রাণে সেই মা'কেই জড়াইয়া ধরিয়া আছেন! দেখিয়া আমরা বিস্মিতা, স্তম্ভিতা ও মুগ্ধা হইলাম। সেই পুরাণে প্রহ্লাদের উপাখ্যানে যাহা শুনিয়াছি—সেই নিষ্কাম ভক্তি কেমন, ভগবানে আত্মসমর্পণ কেমন, ভক্তের বাহিরের শত সহস্র বিপদেও হৃদয়ের অজেয়তা কেমন, তাহা সে দিন স্বচক্ষে দেখিয়া মনে মনে অনুভব করিতে পারিয়াছি। সেই ভক্তিমতী দেবীর পদধূলি মাথায় লইয়া ধন্যা হইয়াছি এবং কৃতার্থ হইয়াছি।

এইখানে বহুদিন শ্রুত একটী গল্প মনে আসিতেছে। চারিজন লোক তাস লইয়া "গ্রাবু খেলা করিতেছিল। এক পক্ষ অপর পক্ষকে হারাইয়া কখনও পঞ্জা কখনও ছক্কা ধরিতেছিল। অনেকগুলি দর্শক নিবিষ্টমনে তাহা দেখিয়া আমোদানুভব করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে যখন খেলা ভাঙ্গিল, তখন অনেক দর্শকই জয়ী পক্ষের নিপুণতা, চতুরতা এবং বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু একজন সেই পরাজিত পক্ষের প্রধান ব্যক্তির পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন, "মহাশয়! আপনি ধন্য!" পরাজিত হাসিয়া কহিলেন, "আমি ধন্য কিসে? খেলায় হারিয়া গিয়াছি, সেই জন্য কি?" দর্শক সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—"তাহা নহে; অপর পক্ষ পুনঃ পুনঃ জিতিয়া প্রবল উৎসাহে খেলিয়াছেন, তাঁহাদের গৌরব আর কোথায়? কিন্তু আপনি ক্রমাগত হারিয়া একটী বার

* মাননীয়া বসু মহাশয়ার এখন এই কন্যাটীই জীবিতা। ভগবান্ এই কন্যাটীকে চিরজীবিনী করুন, পুত্রগুলিও চিরজীবী হউন।

—লেখিকা।

নিরুদ্যম বা বিরক্ত হন নাই ; প্রতিপক্ষ এবং দর্শকগণের কতই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ সহিয়াছেন, তথাপি আপনি স্থির, ধীর ও অবিচলিতচিত্তে খেলিয়াছেন, একবারও আপনাকে বুদ্ধি, স্থৈর্য্য বা উদ্যমভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই। সেই জন্যই আপনিই ধন্য, আপনিই প্রকৃত মনস্বী, আপনিই প্রকৃত পুরুষ!"

আমরাও সেই মহাপ্রাণাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছি, দেবি! এ ত্রিতাপ-দগ্ধ সংসারে আপনিই ধন্যা, আপনিই মনস্বিনী, আপনিই রমণীরত্ন।

মঙ্গলময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

লেখিকা বঙ্গবাসিনী।

আমাদের ইতিকর্ত্তব্যতা।

ভারতে এ যুগে মহাপ্রাণা দেবী আনি-বেশান্তের উদয় সাক্ষাৎ ঈশ্বরকৃপা। বর্ত্ত-মান অমঙ্গলপরম্পরার নিদানে যে গৃহে ও বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষার অভাব, ইহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। বস্তুতই আধ্যাত্মিক বলের প্রয়োগ ও সম্প্রসারণই ইহা নিবারণের একমাত্র উপায়। রাজ-পুরুষগণ, সমাজের নেতৃবর্গ ও ছাত্রগণের পিতা-মাতা, ভ্রাতৃ-বন্ধু-জ্ঞাতি-কুটুম্বাদি হিতৈষী গুরুজন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ত্তৃপক্ষ, সকলেরই এ কার্য্যে সস্থ্য-সমুত্থান ও সমবেত চেষ্টা একান্ত ভাবে নিতান্ত কর্ত্তব্য। নহিলে এ সঙ্কটময় সমস্যার মীমাংসা কদাচ সম্ভাবিত নহে। সকলের পরমভক্তিপাত্রী, লক্ষ্মীরূপা দেবী আনি-বেশান্ত, এ দুর্দ্দৈবশান্তির জন্য শুধু বক্তৃতা দিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি স্বীয় কার্য্যপরম্পরায় স্বতঃ পরতঃ সর্ব্বপ্রযত্নে ইহার প্রতিকারচেষ্টা করিতেছেন। তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত বেনারস্ সেণ্ট্রাল্ হিন্দুকলেজে ও তাহার শাখা-প্রশাখাস্বরূপ নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে "সর্ব্বপাতক-সংহন্ত্রী-সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী" ধর্ম্মশিক্ষার অশেষবিধ সদুপায় অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহার সাধু সঙ্কল্পের ও অক্লান্ত উদ্যমের উপাদেয় ফলও ফলিতেছে। দেখিতেছি, তদীয় মূল ও শাখা-বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রগণ ঈশ্বরভক্ত, রাজভক্ত, গুরুভক্ত, সুবিনীত ও লোকহিতে নিঃস্বার্থ ও প্রশান্তভাবে নিযুক্ত। যেমন এ দেশের উচ্চবংশীয় বালকগণের, তেমনি হীনাবস্থ নিম্নশ্রেণীর বালকগণের এবং সর্ব্বশ্রেণীর বালিকা ও যুবতীগণের সর্ব্বাঙ্গীণ সুশিক্ষা ও সমুন্নতি ইহাঁর জীবনের মহাব্রত এবং এই মহাব্রত-সাধনায় ইহাঁর আত্মা উৎসর্গীকৃত।

ফলতঃ যাবৎ ছাত্রহৃদয়ে বিশ্বজনীন ধর্ম্মনীতির বীজগুলি যথাকালে উপ্ত, অঙ্কুরিত, পরিপুষ্ট ও ফলিত না হইবে,

তাবৎ সহস্র চেষ্টায়, এ দুর্দ্দৈবপ্রতীকারের আশা নাই।

আজকাল আবার মোটা ভাত-কাপড়ে, মোটা চাল-চলনে লোকের মন উঠে না। অগ্রে পশ্চাতে চতুষ্পার্শ্বে অপূর্ব্ব চাকচিক্যময়, বিলাসদ্রব্যের মনোহারিণী মণিহারীর বিপণিপরম্পরা স্তরে স্তরে সজ্জিত। এ সকল আপাতমধুর প্রলোভন-পরম্পরার মধ্যে থাকিয়া, দুর্ব্বল জাতি কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারে? অনেকে আবার ছাত্রজীবনেই পুত্র-কন্যার পিতা। রাজসরকারে আর পূর্ব্বের ন্যায় চাকুরি মিলে না। বর্ষে বর্ষে ভূরি ভূরি ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কত লোককে চাকুরি দিবেন? এ সঙ্কটে কর্ত্তব্য কি? কি উপায় অবলম্বনীয়? "কঃ পন্থা?" ইহাই এক্ষণে চিন্তনীয়।

এ অবস্থায় চতুর্দিকে অজস্র ধারায় দেশীয় কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদির প্রবর্ত্তন, সম্প্রসারণ ও সমুন্নতির জন্য, রাজা ও প্রজা, সকলেরি সমবেত ভাবে চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

"লোকাধারাঃ প্রিয়ো রাজ্ঞাম্"—প্রজাই রাজার রাজলক্ষ্মী। যথায় রাজা-প্রজা সম-দুঃখসুখী, পরস্পর পরস্পরের অনুকূল, অদ্বৈত স্বার্থে উভয়েই নিত্যসম্বদ্ধ, তথায় রাজলক্ষ্মী ষোল কলায় পূর্ণা।

কি হিন্দুধর্ম্মে, কি মুসলমান ধর্ম্মে, এদেশের সকল ধর্ম্মেই রাজা প্রজার মহতী দেবতা, নিত্যনমস্য, নিত্য উপাস্য। হিন্দুর সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য শাস্ত্রকার মনু-অত্রি-যাজ্ঞবল্ক্য-ব্যাসাদি ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ সকলেই সমস্বরে রাজার দেবত্বের ঘোষণা করিয়াছেন। হিন্দুর নিত্যসেব্য পঞ্জিকায় রাজদর্শনের ও রাজপূজার অত্যুচ্চ শুভ-ফলের কথা দেখিতে পাইবে। পাশ্চাত্য জগৎ রাজাকে প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি বলেন, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ, রাজভক্ত হিন্দু-জাতি কি বলেন, শুন।—

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ ॥১॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ ॥২॥
যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নির্ম্মিতো-নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা ॥৩॥
সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ ॥৪
বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি ॥৫॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণম্।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশুদ্রব্যসঞ্চয়ম্ ॥৬॥
তং যস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ম্।
তস্য হ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ ॥৭॥
তস্মাদ্ধর্ম্মং যমিষ্টেষু স ব্যবস্যেন্নরাধিপঃ।
অনিষ্টং চাপ্যনিষ্টেষু তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ ॥৮॥
তস্যার্থে সর্ব্বভূতানাং গোপ্তারং ধর্ম্মমাত্মজম্।
ব্রহ্মতেজোময়ং দণ্ডমসৃজৎ পূর্ব্বমীশ্বরঃ ॥৯॥

তস্য সর্ব্বাণি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
ভয়াদ্‌ভোগায় কল্পন্তে স্বধর্ম্মান্ন চলন্তি চ॥১০॥
তং দেশকালৌ শক্তিঞ্চ বিদ্যাঞ্চাবেক্ষ্য তত্বতঃ।
তথার্হতঃ সম্প্রণয়েন্নরেষন্যায়বর্ত্তিষু॥১১॥
স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ॥১২॥
দণ্ডঃ শাস্তি প্রজাঃ সর্ব্বা দণ্ডএবাভিরক্ষতি।
দণ্ডঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি দণ্ডং ধর্ম্মং বিদুর্বুধাঃ॥১৩॥

(মনু, ৭ম-অধ্যায়।)

—জগৎ অরাজক হইলে, মহাভয়ে সকলেই ব্যাকুল হয়, এজন্য জগৎপাতা জগদীশ্বর চরাচর সমস্ত জগতের রক্ষার জন্য রাজশক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।—
—ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, কুবের, এই অষ্টলোকপালের শাশ্বত সারাংশ গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন।—যেহেতু এই সকল তেজোনিধি লোকপালের সারাংশে রাজা নির্ম্মিত, এজন্য তিনি স্বতেজে সর্ব্বপ্রাণীকে পরাভব করেন।—রাজা, প্রতাপে অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য চন্দ্র-যম-কুবের-বরুণ, ইঁহাদের তুল্য।—রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে মনুষ্যবোধে অবজ্ঞা করিবে না, কারণ তিনি নররূপিণী মহতী দেবতা।—যে ব্যক্তি অসাবধানতায় অগ্নির অতি নিকটে গমন করে, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করে, কিন্তু রাজস্বরূপ অগ্নি অপরাধীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে, তাহাকে সবংশে সর্ব্বস্ব সহিত দগ্ধ করেন।—যে ব্যক্তি মোহবশতঃ রাজদ্বেষী হয়, সে ব্যক্তি নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, রাজা তাহার বিনাশের জন্য অবিলম্বেই কৃতসঙ্কল্প হন।—অতএব রাজা শিষ্টের প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যে নিয়ম ও দুষ্টের প্রতি যে নিয়ম সংস্থাপন করিবেন, সকলকেই তাহার অনুবর্ত্তী হইতে হইবে।—রাজদণ্ড সকলের রক্ষাকর্ত্তা, রাজদণ্ড ঈশ্বরের তেজোময় ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ। রাজদণ্ডভয়ে চরাচর সমুদায় জগৎ স্বাধিকার-ভোগে সমর্থ। রাজদণ্ড না থাকিলে, প্রবলেরা দুর্ব্বলগণকে স্ব স্ব দারধনাদি ভোগ করিতে দিত না।—দণ্ডদানকালে রাজা দেশকালপাত্র ও অপরাধের উদ্দেশ্য ও স্বরূপাদি সবিশেষ বিচারপূর্ব্বক, অখণ্ড্য সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নিরূপণ করিয়া, যাদৃশ অপরাধে যেরূপ দণ্ড দেওয়া উচিত তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্যক্ নির্ণয় করিয়া, অপরাধীর দণ্ডবিধান করিবেন।—উক্ত দণ্ডকেই রাজা অর্থাৎ রাজশক্তি বলিয়া জানিবে। দণ্ডই লোকের শাসনকর্ত্তা, দণ্ডই সর্ব্বাশ্রমের, সর্ব্ববর্ণের ও সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিভূস্বরূপ।—যেহেতু দণ্ডই সমুদায় লোককে শাসন করে, এজন্য দণ্ডকে শাসনকর্ত্তা বলা হইয়াছে। দণ্ডই সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ করে, এজন্য দণ্ডকে রাজা বলা হইয়াছে। সমস্ত লোকসমাজ নিদ্রিত হইলেও কেবল দণ্ডই জাগ্রত থাকিয়া সকলকে রক্ষা করে। এজন্য পণ্ডিতেরা দণ্ডকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলতঃ ঐহিক ও পার-

লৌকিক দণ্ডভয়ে জগতে লোকস্থিতি ও সমুদায় ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাজা-প্রজা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ-অবিশ্বাস পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে। এরূপ সন্দিগ্ধভাব নিবারণ জন্য পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহানুভূতিসাধনের সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বনীয়। এই সূত্রে যদি পরস্পরের অচ্ছেদ্য সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি লোকে বুঝিতে পারে যে, রাজার কুশলেই প্রজার কুশল, প্রজার কুশলেই রাজার কুশল। যদি ভারতবাসী বুঝিতে পারে,—জগতে শত শত রাজশক্তি সত্বেও তাহারা যে আজি উদার ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে, ইহা তাহাদের প্রতি প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকৃপা, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। যে মহাজাতির মধ্যে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া দেবীর ন্যায় ধর্ম্ম-প্রাণা সাম্রাজ্ঞী, ধর্ম্মবীর পুণ্যশ্লোক, বিশ্বজনীন মহাপ্রাণ, বিশ্বব্যাপিনী মহাশান্তির পক্ষপাতী, মহাত্মা এডওয়ার্ডের ন্যায় সম্রাট্, মহাত্মা গ্লাড়ষ্টোন, মর্লি, মিণ্টো প্রভৃতির ন্যায় উদারচেতা সচিবরত্ন, যে জাতির মধ্যে মাক্‌সমূলার, উইলসন্, কোলব্রুক, জনসন, মনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ কাউএল্ প্রভৃতির ন্যায় অগণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানকোবিদ্ মনীষিরত্ন উদিত হইয়া, অত্যদ্ভুত জ্ঞানরত্নের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনাদি দ্বারা এবং বিলুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-বেদবেদান্তাদির উদ্ধার ও প্রচারাদি দ্বারা জগতে অপূর্ব্ব জ্ঞানময় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা আজি মঙ্গলময়ের কৃপায় সেই জ্ঞানবীর, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ইংরাজের অধিকারে বাস করিতেছি। বিশেষতঃ এ দেশে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এ উভয় জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেই রাজা মহতী দেবতা, ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা ছায়া। যাহাতে রাজা বা রাজপুরুষের প্রতি বিদ্বেষের নামগন্ধ আছে,তাহা কদাচ হিন্দু বা মুসলমানের ধর্ম্ম নহে। আজি এ বিষম জীবনসংগ্রামের দিনে রাজা-প্রজা একীভূত হইয়া মনপ্রাণে, প্রশান্তভাবে, বৈধ উপায়ে এ সঙ্কটের নিরাকরণ চেষ্টা কর। রাজবিদ্বেষভাজন হইয়া কেহ কোনও কালেই স্বদেশোন্নতি সাধন করিতে পারে না। ভারতের ত্রিশ কোটি বাহুযুগল, অক্লান্ত কর্ম্মবীর ব্রিটিস বাহুর সহিত সম-প্রাণে মিলিত হইয়া, সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অনন্তশক্তির অপরাজেয় তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও! শ্বেত-কৃষ্ণে গঙ্গা-যমুনার ন্যায় মিলিত হইয়া, সেই ঈশ্বর-সাগরে পতিত হইয়া, দিগ্‌দেশ-কাল, জাতি-বর্ণ-উচ্চ-নীচ-সীমা-পরিচ্ছেদ হারাইয়া, একাধারে ও একাকারে পর্য্যবসিত হও। যে দিন সকলে এ মহা-সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইবে, সেই দিন মঙ্গলসিন্ধু জগদীশ আমাদের সহায় হইয়া, আমাদের শুভ দিন আনয়ন করিবেন।

আমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজপুরুষগণ এ সময় এ সকল তুর্নিমিত্ত শান্তির জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন; আমাদের সকলেরই, ঈশ্বরাজ্ঞার ন্যায় এ

পবিত্র রাজাজ্ঞা সর্ব্বপ্রযত্নে পালন করা কর্ত্তব্য। যিনি ইহাতে উদাসীন থাকিবেন, তিনি বিষম প্রত্যবায়ভাগী হইবেন।

(ক্রমশঃ)

আত্মমুকুর।

(শ্রীমন্ মহর্ষিদেবের ভবনে মহিলা-সমিতি উপলক্ষে লিখিত।)

আমরা অন্তঃপুরবাসিনী বঙ্গবালা। সর্ব্বদা সংকীর্ণ স্থানে বাস, সামান্য বিষয় চিন্তা, সামান্য কাজ কর্ম্মে শরীর-মনের উৎসাহ-উদ্যমের অবসান করে এবং শুধু সাংসারিক প্রবৃত্তিনিচয়ের পরিচালনা করে। পরিজন, স্বামী পুত্রাদির সেবা করিয়া, উদরে অন্ন দিয়া দিনপাত করা বংশানুক্রমে আমাদের অভ্যাস। আমাদের মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী সকলেই এইরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমরা তার উপর বেশীর ভাগ, দুপাতা পড়িতে ও বন্ধু-বান্ধব দু চারজনের সঙ্গে মিশিতে শিখেছি। গৃহসজ্জা ও পরিচ্ছদের আড়ম্বর তাঁদের চেয়ে বেশী আমাদের; স্বামীর উপর আবদার বেশী, খরচও বেশী, তাঁদের চেয়ে আমাদের সবই বেশী বেশী। কিন্তু এ সব বেশী হলে কি হয়, ভিতরে অনেকগুলা জিনিস তাঁদের চেয়ে আমাদের কম হয়ে গেছে। দয়া, মায়া, সহানুভূতি, সংসারে মনযোগিতা সকলই, বোধ হয় যেন, একটু একটু করে ক্রমেই কম হয়ে গেছে। আর একটী প্রধান জিনিস যা আমাদের নারীসমাজ-অঙ্গের প্রাণ, তাও যেন মনে হয় আগের চেয়ে অনেক কম হয়েছে—সেটী হচ্চে ভগবদ্-ভক্তি। প্রাচীন কালে পুরন্ধ্রীগণ গুরু-দেবতার পূজা না করে কোনও অনুষ্ঠান দূরে থাক, এক পা বাড়াতে পারিতেন না। দেবতার ভোগ না দিয়ে, দেবতাকে না নিবেদন করে, তাঁদের কিছুই ব্যবহার করা হইত না। নূতন শস্য উৎপন্ন হইলে, দেবতাকে আগে নিবেদন, নূতন বস্ত্র পরিতে হইলেও দেবতাকে স্মরণ। একই ঈশ্বরের নানা বিভূতি ও নানাশক্তি-ভেদে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার অবতারণা হইয়াছে। মানব জীবনধারণ করিয়া, সেই সকল কারণের কারণ, প্রাণ-দাতা, অন্নদাতা, সর্ব্বসুখদাতা বিধাতাকে যদি স্মরণ না করিয়া দিনযাপন করি, তবে যে আমারা পশুরও অধম। ভারতরমণীর অস্থিমজ্জাগত ধর্ম্মভাব কোথায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা না হইয়া লয় পাইতেছে। তবে আর আমাদের উন্নতির আশা কৈ? এই যে মহিলাসমাজে আজ আমরা মহান্ পবিত্র নামে আহূত হইয়াছি, এই যে উপস্থিত মহিলাগণের হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেমের আভা পড়িয়া পরস্পরের হৃদয় আলোকিত করিতেছে, এই যে মধুর

আহ্বানে প্রাণ মন পুলকিত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছি, এই যে পবিত্র ব্রহ্মনাম গান করিয়া সত্যের মহিমা কীর্ত্তন শুনিয়া হৃদয়ে অপার আনন্দধারা বর্ষিত হইতেছে, বল দেখি ভগিনি! বৃথা আমোদে মত্ত হইয়া, ভগবানের মধুর নাম ভুলিয়া যে কোনও সভা সমিতি,গার্ডেন পার্টি, আমোদ তামাসা হউক না কেন, এরূপ প্রাণের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি, হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া, ভালবাসা বিনিময় আর কি কিছুতে হয়? যে নামের মহিমায় আমাদের শিথিল প্রাণের বন্ধন দৃঢ় হবে, সহানুভূতির ভাব জাগরিত হবে, অন্তরের সব পবিত্র কোমল প্রবৃত্তি-কলিকা বিকশিত হবে, সেই নাম গ্রহণ করে যেন আমরা পরস্পরের সহিত মিলিত হই। পুণ্যশ্লোকা আর্য্য-মহিলার আদর্শ জীবনচ্ছবি সদা সর্ব্বদা যেন আমাদের মানসচক্ষে উদিত থাকিয়া উন্নত পবিত্র জীবনপথে আমাদিগকে অগ্রসর করে। তবে ত ভাবী বংশাবলী ধর্ম্মনীতিতে বিভূষিত হয়ে সনাতন কর্ত্তব্য-পথে অটল থাকিবে ও পরস্পরকে ভাল-বাসিতে শিখিবে, এবং স্বর্গীয় ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষণে সক্ষম হইবে। আমরা সকলে পার্থিব প্রেম লইয়া জন্মিয়াছি, আবার স্বর্গীয় প্রেম লইয়া চলিয়া যাইব। সেই বিধিদত্ত প্রেমের বল সর্ব্বক্ষণ ধারণ করে যদি সকল কার্য্য করিতে পারি, তবে সুখী ও কৃতার্থ হইতে পারিব। এস! সেই বলের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার চরণে ভিখারিণী হই। প্রেমভক্তিবিহীন নারী-জীবন অসার।

বঙ্গমহিলা।

আব্রাহাম্ লিন্‌কন্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ইংরাজীতে একটী কথা প্রচলিত আছে —"The child is the father of the man" অর্থাৎ শৈশবে মানবের ভবিষ্য জীবনের আভাস প্রত্যক্ষ হয়। আব্রাহাম লিন্‌কনের জীবনী আলোচনা করিলে এ কথাটী যে সত্য তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। যে অধ্যবসায় ও কর্ম্মকুশলতার জন্য আব্রাহাম উত্তরকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, শৈশবেই তাহা তাঁহার প্রকৃতিতে লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রণালী হইতেই আমরা তাঁহার মনস্বিতার পরিচয় লাভ করিতে পারি। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন, সে সময় যুক্তরাজ্যে শ্লেট, পেন্‌সিল, কাগজ কলমের ব্যবহার অপরিজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু অবস্থার প্রতিকূলতায় তিনি বর্ণশিক্ষার জন্য ইহার কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। শ্লেট, পেন্‌সিল্ বা কাগজ কলমের অভাবে তিনি অগ্নি-কুণ্ডের পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক জলন্ত অনলে হস্তস্থিত কাষ্ঠখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহার অগ্রভাগ অঙ্গারে পরিণত হইলে তদ্দ্বারা বর্ণলিখন শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

এইরূপ অদ্ভুত বর্ণলিখন-শিক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই; কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের কার্য্য যে কখনও কখনও সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। তাঁহার ন্যায় আরও অনেক প্রতিভাবান্ পুরুষের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সামান্য অবস্থা হইতে আত্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া উন্নতিলাভ অন্য দেশ অপেক্ষা যুক্তরাজ্যে অধিক লক্ষিত হইয়া থাকে। আব্রাহাম লিন্কনের জীবনী ইহার একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আব্রাহাম্ লিন্কন্‌কে বাল্যকালে দারিদ্র্যের সহিত কিরূপ ভীষণ সংগ্রাম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল, তাহা উপরিলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

যাঁহারা উত্তরকালে কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করেন, বাল্যকাল হইতেই বিধাতার মঙ্গল হস্ত, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদের গ্রাস হইতে রক্ষা করে। শৈশবে আব্রাহাম লিন্কনের বিলিগালাহার নামক একজন বন্ধু ছিলেন। উভয়ে সর্ব্বদা একত্র থাকিতেন এবং ক্রীড়া করিতেন। একদিন আব্রাহাম কোন বেগবতী নদীতে সন্তরণ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তিনি গভীর জলে পতিত হইলেন এবং তাহাতে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়া উঠিল। সেই সময় বিলি গালাহার অতুল সাহসে নদীপ্রবাহ হইতে মগ্নপ্রায় বন্ধুকে উত্তোলন করিয়াছিলেন। বিলিগালাহারের সহিত এই সময় হইতে লিন্কন্-পরিবারের ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইয়াছিল। কিন্তু আব্রাহাম অধিক দিন তাঁহার সেই প্রিয়বন্ধুর সহিত একত্র বাস করিতে পারেন নাই। প্রতিকূল অবস্থা অতি অল্পদিনের মধ্যেই উভয় বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন করিয়াছিল।

সংসারে বহু অভাব হইলেও গৃহকর্ত্রী যদি বুদ্ধিমতী হন, তাহা হইলে পারিবারিক শান্তি লোপ পায় না। আব্রাহাম লিনিকনের মাতার বুদ্ধিগুণে লিন্কন-পরিবারে শান্তি বিরাজমান ছিল। নানারূপ অভাবের মধ্যে বাস করিয়াও আব্রাহাম লিন্কন্ জননীর অকৃত্রিম স্নেহে মনের সুখে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জননীর গৃহকর্ম্মে দক্ষতা এবং সুবিবেচনা সত্ত্বেও তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই। তাঁহার পিতা হার্ডিন নগরে জীবিকানির্ব্বাহের সুবিধা না হওয়ায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইণ্ডিয়ানায় গমন করিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইণ্ডিয়ানায় গমন করিবার সময় টমাস লিন্কন্ তাঁহার ভূসম্পত্তি যেরূপে বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা অতি কৌতুকজনক। তিনি তাঁহার ভূসম্পত্তির মূল্য তিন শত ডলার* নির্দ্ধারণ করিলেন, কিন্তু কোনও ক্রেতা উপস্থিত হইলেন না। অবশেষে কলবি নামক এক ব্যক্তি তিন শত ডলার মূল্যের মদিরা প্রদান করিয়া তাঁহার

* ডলার—কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৪ শিলিং ২ পেন্স, প্রায় তিন টাকা।

ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। টমাস লিন্‌কন্ অপর ক্রেতার অভাবে তাহাতেই সম্মত হইলেন। ইণ্ডিয়ানায় গমনের দিন স্থির হইলে, টমাস লিন্‌কন্ তাঁহার গৃহসামগ্রী ও ভূসম্পত্তির মূল্য স্বরূপ মদ্যপূর্ণ পিপা কয়টী একখানি নৌকায় বোঝাই করিলেন এবং স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা সমভিব্যাহারে সেই নৌকায় ইণ্ডিয়ানা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় হইতে আব্রাহাম লিনকন ও তাঁহার প্রাণদাতা বন্ধু বিলি গালাহারের মধ্যে চির-বিচ্ছেদ ঘটিল। একে টমাসের অবস্থা ভাল ছিল না, তাহার উপর দৈবপ্রতিকূলতায় তিনি তাঁহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত সম্পত্তি গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে পারিলেন না। তাঁহার নৌকাখানি যখন ওহিও নদীর মধ্য দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় মদিরার পিপাগুলি একপাশ হইয়া পড়ে। নৌকার লোকদিগের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। সৌভাগ্যক্রমে নৌকাখানি তীর হইতে অধিক দূরে ছিল না। সুতরাং কাহারও প্রাণহানি হইল না এবং কয়েক জন লোকের সাহায্যে টমাস লিন্‌কন্ আপনার জিনিসের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে পারিলেন। মদিরার পিপাগুলির মধ্যে কেবল তিনটিমাত্র পাওয়া গিয়াছিল। দ্রব্যাদি নৌকামধ্যে রক্ষিত হইলে টমাস পুনরায় গন্তব্য স্থানোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। নানারূপ বিপদের মধ্য দিয়া এবং নানারূপ ক্লেশ সহ করিয়া টমাস লিন্‌কন্ স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা সমভিব্যাহারে ইণ্ডিয়ানায় উপস্থিত হইলেন। টমাসের সংসারে তিনি স্বয়ং, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, পুত্র অব্রাহাম এবং একটী কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। কিন্তু সংসারে লোকসংখ্যা অধিক না হইলেও ইণ্ডিয়ানায় আগমনের পর তাঁহাদের একখানি বাসোপযোগী গৃহনির্ম্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি হইয়াছিল। আর্থিক অস্বচ্ছলতা হেতু টমাস লিন্‌কন্ আপনার সঙ্কল্প শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ইণ্ডিয়ানায় কিয়ৎকাল বাসের পর তিনি একখানি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থ ব্যয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করা টমাসের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে প্রধানতঃ নিজের শারীরিক পরিশ্রমেরই উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। কয়েক দিন মধ্যে একখানি সামান্য কুটীর নির্ম্মিত হইল। অল্পবয়স্ক হইলেও আব্রাহাম লিন্‌কন্ এই কুটীর নির্ম্মাণকার্য্যে তাঁহার পিতাকে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছিলেন। কুটীরের তিন দিক্ আবৃত এবং এক দিক্ উন্মুক্ত ছিল। এই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে টমাস পরিবারবর্গ সহ অতিশয় কষ্টের সহিত অবস্থান করিতেন। আব্রাহাম লিন্‌কনের জীবনচরিত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বাল্যকালে কষ্টসহিষ্ণু না হইলে মানব ভবিষ্যৎ জীবনে কেহ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। প্রথম দুই এক বৎসর লিন্‌কন্‌কে ইণ্ডিয়ানায় দারুণ কষ্টে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ভগবানের কৃপায় ক্রমে

যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ইণ্ডিয়ানায় আগমনের পর আব্রাহাম পূর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রমপটু হইয়াছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শারীরিক শক্তি ও ক্লেশসহিষ্ণুতা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। গৃহ-কার্য্যসমাধানান্তে, অবসর পাইলেই, তিনি অপরের কার্য্য করিয়া দিতেন এবং তাহার পারিশ্রমিক আপনার জনক-জননীর হস্তে প্রদান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। যে শ্রমশীলতা ও কার্য্য-নিষ্ঠতার গুণে আব্রাহাম এক সময়ে আমেরিকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ হইয়াছিলেন, এই সময়েই তাহার লক্ষণ তাঁহার চরিত্রে লক্ষিত হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনাথনাথ বসু।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

১। বিবিধ-রোগ-নাশক মুষ্টিযোগ।—মধুর সহিত বড়-হরিতকী-চূর্ণ সেবন করিলে অর্শ, শ্বাস, কাস, জ্বর, পাণ্ডু (নেবা) এবং নেত্ররোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

২। কৃশতা নিবারক ও পুষ্টিজনক মুষ্টিযোগ—আকন্দ-মূল-চূর্ণ, পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধ সহ, বাতপিত্তপ্রধান ধাতুতে ঘৃত সহ, বাতপ্রধান ধাতুতে তৈল সহ এবং বাতশ্লেষ্ম ধাতুতে ঈষদুষ্ণ জল সহ কিছু দিন সেবন করিলে কৃশতা নিবারিত এবং শরীর পুষ্ট হয়।

৩। বালরোগে বেলশুঁট ও আমের আঁটির মজ্জা প্রত্যেক ১ তোলা, জল ৵৷৹ অর্দ্ধ সের, শেষ ৵৹ পুয়া; এই সকল ভিজাইয়া রাখিয়া, সেই জল সহ কাশীর চিনী ও টাট্‌কা খৈ-চূর্ণ খাওয়াইলে বালকের অতিসার ও আমরোগ নিবৃত্ত হয়।

৪। আমড়াছাল-চূর্ণ, আমছাল চূর্ণ ও জামছাল-চূর্ণ তুল্য পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে দুগ্ধপায়ী বালকের অতিসার রোগ বিনষ্ট হয়।

৫। আমের আঁটির মজ্জা-চূর্ণ, খৈ-চূর্ণ ও সৈন্ধব-চূর্ণ একত্র মধুসহ লেহন করাইলে বমি নিবারণ হয়।

নূতন সংবাদ।

১। চীনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আয়োজন চলিতেছে। বিলাতের কামব্রিজ সহরে এ সম্বন্ধে আয়োজনের নিমিত্ত এক সভা হইয়াছিল। কামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ার-ম্যান এ বিষয়ে অতীব আগ্রহ প্রকাশ

করিয়াছেন। চীনে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার আর অধিক বিলম্ব না ঘটিবারই সম্ভাবনা।

২। ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজের কন্যার বিবাহে সাজ-সজ্জাতেই অজস্র অর্থব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই বিবাহব্যাপারে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা সূত্রপাতেই বুঝা যাইতেছে। নবদম্পতীর কল্যাণার্থে এ অর্থ কোনও দেশহিতকার্য্যে ব্যয়িত হইলেই সুখের হইত।

৩। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের গত ৩০শে ডিসেম্বর ৪১৮৩নং ইস্তাহার অনুসারে নদীয়া কুষ্টিয়ার অধীন ত্রিশখানি গ্রাম পূর্ব্ববঙ্গ আসামের ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

৪। পাতিয়ালার মহারাজ স্বীয় রাজ্যে শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়াছেন। রাজ্যমধ্যে স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইবে।

৫। ইণ্ডিয়ান মিরারের লণ্ডনস্থ-সংবাদদাতা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—লর্ড মিণ্টোর পর লর্ড কীচনরের যে ভারতের বড়লাট হইবার কথা উঠিয়াছিল, সে কথা ঠিক্ নহে। হয় লর্ড ক্রু, না হয় লর্ড এবারডিন, এই দুই জনের মধ্যে এক জনের এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। লর্ড ক্রু এখন বিলাতের উপনিবেশ-সচিব ; বয়স ৬২ বৎসর। লর্ড এবারডিন এখন আয়রলণ্ডের শাসনকর্ত্তা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কানাডার গভরনার জেনারেল ছিলেন। ইঁহার বয়স এখন ৬৩ বৎসর।

—

পুস্তকাদি সমালোচনা।

"আমি"—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ সিংহ প্রণীত। এই পুস্তকখানি আত্মানুসন্ধিৎসু ও আত্মোন্নতিকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আত্মতত্ত্ব সম্যক্ অনুশীলিত না হইলে, বিশ্বনাথের এ বিশ্বরাজ্যে মানবের বিশেষত্ব কোথা? আত্মতত্ত্বানুশীলনদ্বারা মানব যতই ঈশ্বরোন্মুখ হয়, ততই তাহার পূর্ণতা। অক্ষয় ব্রহ্মাগ্নি প্রত্যেক জীবাত্মায় নিহিত। সাধনা সমীরণ দ্বারা সেই অগ্নি প্রস্ফুরিত হয়। শেষে, "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে",—তখন সে জীবাগ্নি ও ব্রহ্মাগ্নি একীভূত হইয়া, এই জন্ম-জরা-মরণ ধর্ম্মী জীবকে সত্যময়—আনন্দময়—স্বপ্রকাশ—চিন্ময়—বৈষম্যান্তরস্পর্শশূন্য ব্রহ্মভাবে পরিণত করে। তখন সে মুক্তজীব। সে তখন জীবলোকের কল্যাণার্থে স্বেচ্ছায় নানা রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। আবার কূর্ম্মের ন্যায় আপনাকে আত্মাতেই বিলীন করিয়া, অরূপ, চিন্ময়ভাবে অবস্থান করিতে পারে। কৃষ্ণ-চৈতন্য-বুদ্ধ-খৃষ্ট-নানক-মহম্মদ প্রভৃতি এ মহাসাধনার মূর্ত্তিমান্ দৃষ্টান্ত। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—আমার কতশত

জন্মকর্ম্ম অতীত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলে, নরজন্মই এ মহাসাধনার সোপান। দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়াও যিনি এ সাধনা-সোপান আশ্রয় না করিয়া অপথে পদার্পণ করেন, তিনি মহাশূন্যে নিরন্তর ঘূর্ণ্যমান গ্রহপিণ্ডের ন্যায় চির-নিরাশ্রয়।

প্রবীণ, তত্ত্বদর্শী গ্রন্থকার এ সকল অমূল্য অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জ্ঞানরত্নাকর আর্য্য-শাস্ত্রসিন্ধু হইতে উদ্ধৃত করিয়া, প্রমাণাদি সহ প্রদর্শন করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, সংহিতা, বৌদ্ধশাস্ত্র, কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত, বহুল অনর্ঘ্য রত্নরাজির সমাবেশে গ্রন্থখানি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। আশা করি, স্বদেশবাসীরা ইহা সাদরে পাঠ করিয়া, ইঁহার ঈদৃশ কল্যাণী সাধনাকে সার্থক করিবেন।

এ পুস্তকে একটী কথা ভাল লাগিল না। গ্রন্থকার ব্রাহ্মণগণের উপর সক্রোধ কটাক্ষপাত করিয়াছেন। কাহারও উপর কটাক্ষ না করিয়া, উদাসীনভাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করা ভাল। প্রথমতঃ লোকের প্রকৃতি, শক্তি, গুণ ও কর্ম্ম প্রভৃতি ভেদেই বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎকালে যাঁহারা স্বভাবতঃ সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-নামে, যাঁহারা রাজসিকভাবাপন্ন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়-নামে, এবং যাঁহারা তামসিকভাবাপন্ন, তাঁহারা শূদ্রনামে অভিহিত হইতেন। যদি কেহ স্বীয় সাধনাবলে উচ্চপ্রকৃতি লাভ করিতেন, তিনিও উচ্চবর্ণে উন্নীত ও বিশ্বপূজ্য হইতেন ; যথা,—বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, শ্রমণা প্রভৃতি। ইঁহারা কি কোটি কোটি হিন্দুর পূজ্য নহেন? এ সকল কথা "সমাজসংস্কার" নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। কথায় বলে,—"রাখালের হাতে শালগ্রাম নষ্ট।" অনধিকারীর হস্তে পড়িলে, উপাদেয় অমূল্য পদার্থেরও শোচনীয় দুর্গতি হয়। এজন্যই আর্য্যশাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোক-কল্যাণই তাঁহাদের সাধনীয়। সর্ব্বভূতে সর্ব্বত্রই সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরম-জ্যোতিকে প্রত্যক্ষ করিয়া, তদ্‌ভাবে তন্ময় হইয়া মন্বাদি ব্রহ্মযোগীরা যে সকল বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতে অস্মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধিগণের দোষারোপ সঙ্গত নহে। যাহা হউক, গ্রন্থকারের ধর্ম্মভাব ও ভূয়সী গবেষণাসন্দর্শনে সহৃদয়মাত্রেই প্রীত হইবেন, সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি বুদ্ধখৃষ্টাদির অপূর্ব্ব সুচিত্রে অলঙ্কৃত। ছাপা ও কাগজ সুন্দর। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান,—৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বামারচনা।

(পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দত্তের শুভ বিবাহে নববধূ-বরণ।)

শুভাশীর্ব্বাদ।

১

বিধাতার শুভাশীষে
সুমঙ্গল লয়ে সনে,
সুকল্যাণী গৃহলক্ষ্মি!
এস গৃহে শুভক্ষণে!

২

স্নেহ-প্রীতি-শুভ-আশা
চিরদিন রাখি প্রাণে,
এ গৃহ তোমারি লাগি
চেয়েছিল পথপানে।

৩

কেমনে আসিবে তুমি
কেমনে লইব ব'রি,
কেমনে স্থাপিব তোমা
রাজরাজেশ্বরী করি?

৪

কেমনে সেবিকা-রূপে
ল'বে তুমি গৃহভার,
কেমনে মিলিবে, হয়ে
আমাদেরি আপনার?

৫

বিধির প্রসাদে আজি
পূর্ণ সে কল্পনা আশা,
তবু কেন কাঁদে প্রাণ,
বুকে জাগে কি পিপাসা?

৬

যাঁহাদের আদরের,
যতনের ধন তুমি—
কোথা সেই মাতা পিতা
কে লইবে শিরে চুমি!

৭

নববধূ সনে আজি
প্রাণাধিক সুকুমার,
না পাইল স্নেহাশীষ
দেব দেবী বাবা মার।

৮

তাঁদের সাধের বধূ
সোহাগের শতদল,
নীরবে ফুটিলে আসি
তাই বহে আঁখিজল।

৯

যাও অশ্রু, এস বোন্!
চির-আঁধারের আলো!
প্রীতি দয়া-সুধাধারা
প্রতপ্ত হৃদয়ে ঢালো!

১০

প্রেম, ভক্তি, সরলতা
চিরদিন থাক বুকে,
সরল পবিত্র হাসি
মাখা থাক সোণামুখে।

১১

স্বদেশের সুমঙ্গলে
খাটিও পরাণ পণে,
"জননী জনমভূমি"
সতত রাখিও মনে।

১২

অনাথ দরিদ্র যেন
মা' বলি ভাবিতে পারে,
দেহ, মন, প্রাণ ঢালি
দিও বিশ্ববিধাতারে।

১৩

সতত সুপত্নীরূপে
তুষিও পতির মন,
"অনুকূলা দয়াময়ী"
জানুক দেবরগণ।

১৪

স্বর্গ হতে মাতা-পিতা
দিন শুভ আশীর্ব্বাদ,
গৃহে হোক সুমঙ্গল,
পূর্ণ হোক শুভ সাধ।

১৫

এলে যে পবিত্র কুলে
সে কুল গৌরব রেখ,
সুখে দুঃখে অচঞ্চলা
বিভুর চরণে থেক।

১৬

জনম এয়োতী হও,
পতিপ্রাণা যশস্বিনী,
এস গৃহে গৃহলক্ষ্মি!
আমন্ত্রিছে ননদিনী।

১৬ই মাঘ, ১৩১৬ সাল।　শুভাশীর্ব্বাদিকা ননদিনীগণ।

রমেশচন্দ্র দত্তের স্বর্গারোহণ।

বঙ্গ-মাতা-প্রিয়পুত্র বাঙ্গালির বল,
সাহিত্য-উজ্জ্বল রত্ন ভারতমঙ্গল!
কোথা যাও কর্ম্মবীর পণ্ডিত রমেশ?
এ ক্ষেত্রের কার্য্যাবলি হল অবশেষ?
বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে তোমারি অভাবে,
তীক্ষ্ণ বেদনায় মগ্ন নর-নারী সবে।
নিরাশায় ম্রিয়মাণ মনস্তাপে হত,
ভারতগৌরব রবি তমসা আবৃত।
আকুল মরমতল বহে অশ্রুধারা,
জন্মভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হায় তোমাহারা!
পুণ্যশ্লোক দেবচিত্ত অমরা যাচিত,
সুরসিংহাসন আজি হইল শোভিত।
বরিষ সান্ত্বনাধারা দেবগণ-সাথে,
স্বদেশ-স্বজনোপরি স্বরগ হইতে॥

মনোজবারচম্পিত্রী।

প্রার্থনা।

দুরবহ হৃদিভার লয়ে
বল প্রভু! আর কত দিন
রঙ্গভূমি এ সংসারমাঝে
ছদ্মবেশে করিব ভ্রমণ?

দিন যায়, যায় কত বর্ষ
অতীতের তম-গর্ভতলে
একে একে মিশিতেছে সব,
মহালয় প্রলয়ের কোলে।
তবু কেন এছার বাসনা
হৃদি লয়ে সতত বিব্রত ?

রুদ্ধ হিয়া উড়িবারে চায়
মোহভ্রান্ত উন্মাদের মত।
দুরবল হৃদয়ের গতি
প্রশমিতে পারিনা যে আমি,
অন্ধসম ছুটে যাই কোথা,
ধর ধর অখিলের স্বামী !!

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়, নিলফামারী।

রমণীজন্মের বরণ ও উৎসব।

দিয়াছ রমণীজন্ম দেব দয়াময় !
মনোনীত করে যায়,
দিছিলে এ অধমায়,
তাহাই পরম শিব নাহিক সংশয়।
আমি কিন্তু ভাল মনে,
আহা সে পরম ধনে,
নব জীবনের আগে করিনি গ্রহণ ;
এ হেন অধম দেশে,
কেন গো নারীর বেশে,
পাঠালে আমায় বলে করেছি নিন্দন।
যেই দিন শুভদৃষ্টি,
পবিত্র অমৃতবৃষ্টি,
ঘটিল তোমার সাথে মধুর মিলন,
বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম,
স্বর্গ-মণিময় হেম,
উঠিল আত্মাতে ফুটি মানসমোহন ;—
জীবেতে প্রেমের রেখা,
উজিদে সে প্রেমলেখা,

ছুটিল চৌদিকে বেগে প্রেমের কিরণ,
চরাচর বসুন্ধরা,
হ'ল সব প্রেমে ভরা,
যে দিন বুঝিনু প্রেম কি অপূর্ব্ব ধন !
সে দিন নূতন করি,
রমণীজনমে বরি,
ধরিয়া মরমমাঝে পবিত্র নির্ম্মল,
আনন্দসাগরে ভাসি,
ধন্যবাদ রাশি রাশি
তব পদে দিনু দেব ! মম বিরদল ;—
উৎসর্গ করিনু তায়,
দীপ্ত প্রেম মহিমায়;
গাহিল হৃদয় নারীজনমের জয় !—
(আত্মহারা যুক্ত করে)
অনন্ত জীবন তরে,
যাচিনু ভকতিভরে
অক্ষয় রমণীজন্ম প্রেমসুধাময়।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 559. March, 1910.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫৯ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩১৬। মার্চ্চ, ১৯১০। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ব্যবস্থাপক সভায় স্ত্রী-সভ্য—এ বৎসর ফিনিস ব্যবস্থাপক সভায় ১৫ জন স্ত্রীলোক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত বৎসর ২৫ জন ছিলেন এবং ১৯০৭ সনে ১৭ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

যুক্ত-প্রদেশের সমাজসংস্কার-সমিতি—২৮শে মার্চ্চ কাশীধামে যুক্ত-প্রদেশের সমাজসংস্কারসমিতির চতুর্থ অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে, তাহার সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

(১) স্ত্রীশিক্ষার অবাধ বিস্তার আবশ্যক এবং তদর্থে বিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত।

(২) বালক বালিকাদিগের বিবাহের বয়স ২০ এবং ১৪ বৎসর হওয়া উচিত।

(৩) অবরোধপ্রথার সংস্কার আবশ্যক।

(৪) যুক্তপ্রদেশে নানা দোষ বৃদ্ধি হইতেছে। মাদক নিবারণ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতি করিতে হইবে।

(৫) সামাজিক পবিত্রতা রক্ষার আবশ্যকতা। ধর্ম্ম এবং উৎসব উপলক্ষে বাইনাচ প্রভৃতি দেওয়ার প্রতিবাদ।

(৬) সমুদ্রযাত্রায় উৎসাহদান এবং বিদেশাগত ও হিন্দুসমাজে সহানুভূতিযুক্ত ও হিন্দুসমাজ ত্যাগে অনিচ্ছুককে হিন্দু-সমাজে গ্রহণ।

(৭) হিন্দুসমাজের নানাবর্ণকে একত্র করিবার চেষ্টা এবং ভারতের সর্ব্বত্র অন্ততঃ সবর্ণে সবর্ণে বিবাহপ্রচলন।

(৮) উপেক্ষিত জাতিসমূহের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা।

ত্রিবাঙ্কুরে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার—শ্রীমতী কল্যাণী আখ্যা, শ্রীমতী চারুকুট্টা

আথা নাম্নী ত্রিবাঙ্কুরের নায়রজাতীয়া দুইটী মহিলা বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। প্রথমোক্ত মহিলাটী পূর্ব্বে অন্যান্য বিষয়ে উত্তীর্ণা হইয়া এবার দর্শন-শাস্ত্রে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি কয়েকখানি দেশীয় ভাষায় লিখিত পত্রিকার সম্পাদিকা এবং ত্রিবাঙ্কুরের স্ত্রীলোক-দিগের উপকারের জন্য মালায়লম ভাষায় কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। অপর মহিলাটী ইংরাজি মালায়লম পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

আজি কালি ভারতের সর্ব্বত্র স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের কথা বড়ই শুভসংবাদ। আশা করা যায়, শিক্ষিতা রমণীরা শুধু উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াই নিশ্চিন্ত না হন। তাঁহাদের সম্মুখে অসীম কর্ম্মসাগর বিস্তীর্ণ। তাঁহারা সংসারক্ষেত্রে তাঁহাদের শিক্ষার পূর্ণ পরিচয় দান করিতে পারিলেই এ দেশ মহোন্নতি লাভ করিতে পারিবে। এ জগতে যথায় যাহা কিছু মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রেমময় নারীহৃদয়ই তাহার নেতা। ধর্ম্মপ্রাণা রমণীর হৃদয়ের উপর আমাদের ক্ষুদ্র গৃহস্থালী হইতে সুবিশাল লোকসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ সংস্কার ও মহোন্নতি নির্ভর করে।

"পতিব্রতা দানশীলাঃ সত্যশৌচপরায়ণাঃ।
অলুব্ধাঃ করুণাপূর্ণা ধারয়ন্তি মহীমিমাম্॥"

—যাঁহারা পতিব্রতা,দানশীলা, সত্যশৌচ-পরায়ণা, অলুব্ধস্বভাবা, সহস্র প্রলোভনেও ধর্ম্মপথে অটলা, করুণহৃদয়া, তাঁহারাই এ লোকসমাজ রক্ষা করিতেছেন।

যে শিক্ষায় বিশ্বজনীন হিতৈষণার, মহা-সংযমশীলতার, গৃহস্থালীর সর্ব্বাঙ্গীণ শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব সাধনের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত হয়, সে শিক্ষা বিষবৎ পরিহার্য্য। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার উদ্যোগী ও নেতৃগণের এ পক্ষে সর্ব্বতোভাবে সতর্কতা একান্ত প্রার্থনীয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধগণের সম্মিলন-প্রস্তাব—কোলপুর হইতে টেলিগ্রামে সংবাদ আসিয়াছে,—ভারতীয় শঙ্করাচার্য্য মঠসকলের সর্ব্বপ্রধান গুরুদেব, মহামান্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু হাম্পি মহোদয়ের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত করস্থান মহোদয় গবর্ণর জেনেরাল লর্ড মিণ্টো মহোদয়কে তার-যোগে জানাইয়াছেন,—ভগবৎপূজ্যপাদ, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ গুরু দালাইলামা ও শ্রীশঙ্করাচার্য্য জগদ্‌গুরু, ইঁহারা উভয়ে শীঘ্রই পরস্পর সাক্ষাৎকার ও সম্ভাষণাদি করিবেন। এই সুন্দর সুযোগে আপনি যদি কৃপা করিয়া, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মে পরস্পর চিরবৈরকলঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, উভয় সম্প্রদায়মধ্যে, স্থায়ী সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তবে জগতের একটী অতুলনীয় মহোপকার সাধিত হয়।

বস্তুতই ধর্ম্মবিরোধ এ জগতে অশেষ অনর্থপরম্পরার নিদান। একদা রোমান্ ক্যাথলিক্ ও প্রোটেষ্টাণ্ট এ উভয় সম্প্র-দায়ের বিরোধে য়ুরোপভূখণ্ডে মহাপ্রলয় ঘটিয়াছিল। অতি বীভৎসভাবে নরহত্যা-শোণিতে দেশসকল প্লাবিত হইয়াছিল। জলদনলে কত শত জীবিত মানব দগ্ধ

হইয়াছিল। এইরূপ বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের এবং হিন্দু ও মহম্মদধর্ম্মের পরস্পর ভীষণ সঙ্ঘর্ষে লোমহর্ষণ অনর্থপাত হইয়াছে ও হইতেছে। মানবমাত্রেই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—বিশ্বনাথের সন্তান, এজন্য ভাই-ভাই। ভ্রাতৃরক্ত ও নিজরক্ত অভিন্ন। এ সামান্য জ্ঞানটুকু থাকিলেই ত সমস্ত বিরোধ ভঞ্জন হয়। হায়! আমরা এমনি অন্ধ যে, এ সামান্য জ্ঞানটুকুও আমাদের নাই।

পিতৃদেব-চরিত।

ইহাতে সংক্ষেপে একটী পুণ্যময় চরিতামৃত বিবৃত হইতেছে। প্রায় ৪০ বর্ষ গত হইল, আমার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ হইলে, প্রখ্যাতনামা সোমপ্রকাশসম্পাদক, সংস্কৃতকলেজের অধ্যাপক ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় নিজ পত্রিকায় তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করিতেছিলেন। অনন্তর সে ভার তিনি আমার উপর অর্পণ করেন। আমার পিতৃদেবের পরম স্নেহাস্পদ ৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বামাবোধিনীতে তদীয় জীবনী ক্রমশঃ প্রকাশের জন্য বিশেষ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময় এ অতীব প্রয়োজনীয় মহৎ কার্য্যটী করা হয় নাই। এক্ষণে কয়েকটী মাননীয় বন্ধুর একান্ত অনুরোধে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। সময়ে এ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, যেরূপ হইত, এক্ষণে আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি জগৎপাবন মহাজনচরিত যতটুকু প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাল।

এই ঘোর তামসযুগ কলিকালেও আবার সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি বিদ্যমান। এই কলিযুগেও কিছুকাল পূর্ব্বে আমাদের সংসারে অপূর্ব্ব সত্যযুগের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার কিঞ্চিৎ আভাস, বাল্যে ও যৌবনে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, দিতেছি। কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুর, হরিনাভি প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজে আমাদের সংসার ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। আমার ৺ পিতামহ মহামহোপাধ্যায় রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত এবং আমার ৺ পিতৃদেব কৃষ্ণমোহন শিরোমণি (১) বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক (কথক) ছিলেন। কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণ কোদালিয়া গ্রামে আমাদের বাস। আমার ৺ পিতামহ রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন উক্ত গ্রামে বাস করায় এবং গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী গোঘাটা নামক গঙ্গাঘাটে স্নান করায় নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা বলিতেন,—

"কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।

(১) ইনিই বঙ্গের 'কৃষ্ণহরি কথক' নামে বিখ্যাত। প্রকৃত নাম কৃষ্ণমোহন।